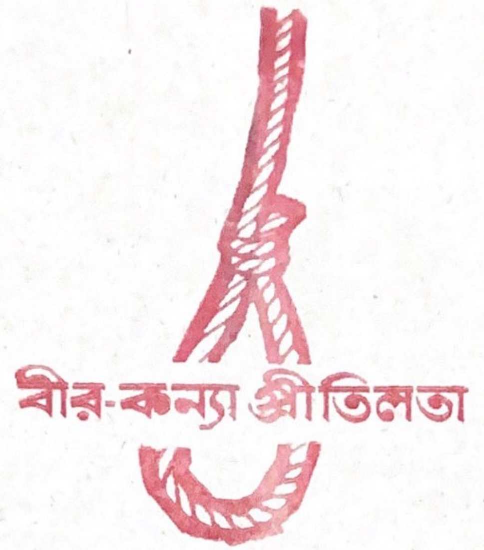


# বীরকন্যা প্রীতিলতা

বীর-কন্যা
প্রীতিলতা

পূর্ণেন্দু দস্তিদার



# বীর-কন্যা প্রীতিলতা

পূর্ণেন্দু দস্তিদার

প্রকাশনা ঃ
এম, আবদুল হক
প্রকাশ ভবন
৫, বাংলা বাজার, ঢাকা—১

মুদ্রণ ঃ
ইফতেখার রসুল জর্জ
প্রান্তিকা মুদ্রণী
৪৩, দীননাথ সেন রোড, ঢাকা—৪

প্রচ্ছদপট ঃ
হারাধন বর্মণ

প্রথম প্রকাশ ঃ
বৈশাখ—১৩৭৭
পুনর্মুদ্রণ ঃ আষাঢ়—১৩৭৯
পুনর্মুদ্রণ ঃ বৈশাখ—১৩৮৫

দাম ঃ দশ টাকা

বাংলাদেশের সংগ্রামী মা-বোনদের

## ভূমিকা নয়—শ্রদ্ধাঞ্জলি

খাওলা, খালেদা, লক্ষ্মীবাই, চাঁদ সুলতানা, সুলতানা রিজিয়া ইতিহাসে অমর। শতাব্দী অতীত, তবুও তাদের স্মৃতি অমলিন বীরাঙ্গনা, বীরকন্যারূপে। তাদের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিতা। আর বাংলাদেশের একটি বীরকন্যার আত্মদানে বাংলা দেশ মহিমান্বিতা। আমরা এ দেশের মাতা, বধূ, ভগিনী, কন্যারা তাঁর স্মরণে ধন্যা।

১৯৩২ ইং ২৩শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন নিজ মাতৃভূমিকে ইংরেজ শাসকের হাত থেকে মুক্ত করতে, তার মধ্যে বীরকন্যা প্রীতিলতা প্রথম মহিলা শহীদ। সম্মানে, শ্রদ্ধায় তাঁকে স্মরণ করি।

'বীর-কন্যা প্রীতিলতা' গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত পুর্ণেন্দু দস্তিদার তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা লেখার জন্য আমার মতো অযোগ্যকে কেন যে অনুরোধ করেছেন, জানি না। কারুর কোনো বইয়ের ভূমিকা কিংবা সমালোচনা বা আলোচনা করার স্পর্ধা আমি কখনও করেছি বলে মনে পড়ে না। আর এই বীরবালার জীবনীর ভূমিকা লেখার যোগ্যতা বা ধৃষ্টতাও আমার নেই।

আমি বাংলা দেশের মা-বোন বধূ-কন্যাদের পক্ষ থেকে গ্রন্থকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি এই জন্য যে, আমাদের দেশের —বাংলা দেশের মহিলাকুল এই গ্রন্থপাঠে উপকৃতা হবেন। প্রীতিলতার জীবনীপাঠে আমাদের দেশের মেয়েরা প্রেরণালাভ করুন। সাহসে, বীর্যে, সংগ্রামে, সংকটে আমাদের দেশের মেয়েরা যে কত মহিমাময়ী এই গ্রন্থ তার পরিচয় দান করবে। শক্তিময়ী, সাহসিকা, বীর-কন্যা প্রীতিলতাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধায় স্মরণ করি।

সুফিয়া কামাল

৩০-৯-৬৯ ইং
৬৫৮-এ ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা,
রাস্তা নং ৩২, ঢাকা—২

## লেখকের কথা

"স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম" প্রকাশিত হবার পর বীর-কন্যা প্রীতিলতার একটি আলাদা জীবনকাহিনী লেখার তাগিদ আমার কাছে অনেকের কাছ থেকে আসে। তার মধ্যে অবশ্য মা-বোনদের সংখ্যাই বেশী।

প্রীতিলতা আমার সহোদর ছোট বোনের মত। তার জন্ম আমাদের গ্রামের বাড়িতেই। খুব অল্পবয়সে পিতৃহীন হয়ে প্রীতিলতার পিতা পার্শ্ববর্তী গ্রাম ডেঙ্গাপাড়া থেকে বিধবা মায়ের সঙ্গে তাঁর মাতুলালয়ে ধলঘাট নামে আমাদের বাড়িতে আসেন। তাঁর মামা ( আমার পিতামহ ) তাঁর মা ও অন্য দুই ছোট ভাইয়ের জন্য আমাদের নামের ভদ্রাসনের এক অংশ বসবাসের জন্য ছেড়ে দেন। পরে ঐ বাড়ীতেই প্রীতিলতার জন্ম হয়।

ক্রমে প্রীতিলতার ছাত্রীজীবন থেকে তার বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে আসা ও রাজনৈতিক কাজে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ১৯৩০-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সব ব্যাপারেই আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকায়, তার জীবনী লেখার দায়িত্ব নিতে আমি ভরসা পেয়েছি।

উপরোক্ত সময়ে ইংরেজ সরকারের হাতে আমাকে যখন ধরা পড়তে হয়, তারপর যে তিন দিন দিবারাত্র অবিশ্রাম আমাকে অকথ্য নির্যাতন ও জিজ্ঞাসাবাদে উৎপীড়িত হতে হয় তখন উচ্চ গোয়েন্দা কর্মচারীরা অন্যান্য অনেক প্রশ্নের মধ্যে প্রীতিলতার কথাও আমাকে বহুবার জিজ্ঞাসা করে এবং তার ফটো দেখিয়ে তাকে চিনি কিনা জিজ্ঞাসা করে। তখনকার বিপ্লবীদলের কঠোর নিয়মে আমি তাকে চিনি না বলি।

তারপর ১৯৩১ সালে পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের কিছুদিন আগে আত্মগোপনে যাবার জন্য প্রীতিলতা যখন তাদের শহরের বাসা ত্যাগ করে, তখন আমি দেউলী আটকখানায় ( রাজপুতনার আজমীর মাড়বার ) তার শেষ চিঠি পাই। আটকখানার

সে নিয়মিত আমাকে চিঠি লিখত। তার ঐ চিঠিখানার কাঁচি-কাটা, অতি সামান্য অংশই আমি পেয়েছিলাম। তাতে প্রীতিলতার একটি কবিতাও ছিল। ঐ কবিতার শেষ দুই লাইন গোয়েন্দা পুলিশের 'সেন্সর'-কর্তৃপক্ষ দয়া করে কাঁচির ছোবল থেকে বাদ দিয়েছিল। তাতে ছিল :

'আঁধার পথে দিলাম পাড়ি
মরণ-স্বপন দেখে।'

ঐ আটকখানায় বসেই পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণে তার নেতৃত্বের খবর সংবাদপত্র মারফত পাই। ঘটনার বেশ কয়েকমাস পরে তার বাবা মা ( বর্তমানে উভয়েই পরলোকগত ) আমাকে তার খবর এবং তাঁদের উপর সেই কারণে যেসব নিগ্রহ চলছে, তা পত্রযোগে জানান।

বহুদিন পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে চট্টগ্রামের দেশপ্রেমিক অবদানের একটি ইতিহাস রচনার সংকল্প যখন আমি করি, তখন অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে প্রীতিলতার সমসাময়িক গুণগ্রাহী ও সহযাত্রীদের দ্বারা সযত্নে রক্ষিত প্রীতিলতার রোজনামচার অংশবিশেষের নকল, তার শেষ বিবৃতি ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারি। তার মা বাবা অথবা চট্টগ্রামের অন্য কারও কাছে তার কোন ফটো ছিল না। বহু কষ্টে খবর পাওয়া যায় যে, সে ১৯২৯-এ ঢাকায় ইডেন কলেজ থেকে আই-এ পরীক্ষায় যখন খুব ভাল করে, তখন ঐ কলেজ থেকে বিদায় সম্বর্ধনা উপলক্ষে প্রীতিলতা কলেজের সব অধ্যাপিকা ও ছাত্রীদের সঙ্গে এক সমবেত ফটোর মধ্যে উপস্থিত ছিল। প্রীতিলতার এক সহপাঠিনীর কাছে কলিকাতায় ঐ ফটো পাওয়া যায়। স্বভাবতঃ লাজুক প্রকৃতির প্রীতিলতা অসংখ্য মেয়ের সারিতে একেবারে পিছন দিকে ঐ ফটোতে ছিল। তার খুব ছোট মুখখানা ঐ ফটো থেকে নিয়ে আমি আমার অক্ষম হাতে একটি বড় করে ছবি আঁকি এবং

তার বাবা মাকে দিই। এই বই ও অন্যান্য যেসব বইতে প্রীতি-লতার আবক্ষ ছবি দেখা যায় তা ঐ একমাত্র ছবির অনুলিপি।

এইভাবে তৎকালীন বিপ্লবযুগের প্রথম নারী শহীদ প্রীতিলতার এই জীবনকথা রচিত হয়েছে। প্রায় তিন যুগ পূর্বে চট্টগ্রামের একটি তরুণী নিজের মাতৃভূমিকে সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত করার জন্য যে 'মরণ-স্বপন' দেখেছিল তার কর্মপন্থা যুগের সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্দেহে পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু তার দেশপ্রেম প্রশ্নাতীত, তার অটুট আদর্শ নিষ্ঠা আজও প্রেরণাসঞ্চারী।

ভিয়েতনাম, আলজিরিয়া, আরবভূমি ও বিশ্বের অনেক সাম্রাজ্য-বাদ-সামন্তবাদ শোষিত দেশে বহু মেয়ে মুক্তিযুদ্ধে আত্মদান করে নারীর সংগ্রামী মর্যাদা ও দক্ষতার নূতন ইতিহাস রচনা করছে ও করেছে। এরা প্রীতিলতার পতাকাবাহী।

প্রীতিলতার এই ৩৭তম শহীদ দিবসে রচিত এই জীবনকথা আমার দেশের মেয়েদের মুক্তি-প্রেরণায় যদি সামান্য সহায়ক হয়, তা'হলেই লেখক কৃতার্থ বোধ করবে।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ ইং
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।

যদিও শহরের মধ্যেই এই পাড়া তবু মনে হয় শান্ত সুনিবিড় পল্লীর কোলেই এরা আছে। বড় বড় আম, জাম, নিম আর কাঁঠাল গাছ। বুনো আসামলতার ঝাড় ছোট পুকুরটির দক্ষিণ পাড়কে ঘিরে রেখেছে। আরও দক্ষিণে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির বড় নালা। বর্ষার সময় এই নালা পাশের পাহাড়ী ও উঁচু জায়গার জলের ঢল নিয়ে ঠিক গ্রামের নদী আর খালের মতই ভরে ওঠে, স্রোতময়ী হয়ে সগর্বে সশব্দে ছুটে চলে।

শহরের মধ্য-পশ্চিম এলাকায় প্রকাণ্ড আসকার খানের দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণা থেকে নেমে গেছে সরু গলি। তা দিয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাবার সময় শহরকে বিদায় দিয়ে যেন গ্রামে প্রবেশ করা। গরীব মধ্যবিত্ত কিছু পরিবার এখানে বাঁশের ঘর করে বাস করে। তাদের মধ্যে যাদের আর্থিক অবস্থা কিছু ভাল, তারা মাটির দোতলা বা একতলা কোঠা তৈরী করেছে।

এ গলি দিয়ে যেতে যেতে শেষ প্রান্তে একেবারে মিউনিসি-প্যালিটির বড় নালার উত্তরে পাশাপাশি দু'খানা মাটির দোতলা বাড়ী। একটিতে টিনের ছাউনি, অন্যটি বাঁশের তর্জা দিয়ে ছাওয়া।

প্রথমটিতে বাড়ী দু'খানার মালিক মিউনিসিপ্যাল আপিসের হেড কেরানী জগবন্ধু ওয়াদ্দাদার সপরিবারে থাকেন। অন্যটি তিনি মাসিক দশ টাকায় ভাড়া দিয়েছেন।

বাসার সামনে কিছুটা জায়গা ঘিরে তাতে ফুলের বাগান করেছে ছেলেমেয়েরা। তবে মৌসুমী কোন ফুল তার মধ্যে দেখা যাবে না। জবা, গন্ধরাজ, স্থলপদ্ম, বেল, মালতী, গেঁদা—এই ধরণের সব ফুলগাছ ঐ বাগানে আছে। খুব শৃঙ্খলা করে সাজিয়ে বাগান করা নয়, ফুলের মতই সুন্দর ছোট ছোট মানুষগুলির খেয়াল হয়েছে, কারও কাছ থেকে বর্ষার সময় ফুলের ডাল চেয়ে এনেছে আর মাটিতে পুঁতে রেখে দিয়েছে। ভাল মাটি, তাই বিনা যত্নেই ফুলগাছ বেড়ে উঠেছে। অকৃপণ সমারোহে ফুলের সম্ভার নিয়ে ঋতুতে ঋতুতে হেসে উঠেছে কোলাহল থেকে দূরে শান্তশ্রী এই অঙ্গনটিতে।

কেরানীবাবুর বড় ছেলে লেখাপড়া মোটেই করতে চায় না। বাসার কাছেই যে দুই তিন ঘর ধোপা আছে, প্রায়ই তাদের ওখানে গিয়ে আড্ডা দেয়। তাদের সঙ্গে বসে দু'এক টান তামাক খায়। স্কুলে ভর্তি করে দিলেও পড়া না শিখে গেলে শাস্তি পাওয়ার ভয়ে প্রায়ই বইপত্র নিয়ে ঐ ধোপাদের বাড়ীর নারকেলী কাল হুঁকোটির কাছে গিয়েই তার স্কুলের কাজ সমাধা করে। বাবা কত শাসন করেন অন্য সন্তানদের। কিন্তু এই অবাধ্য, দুরন্ত জ্যেষ্ঠপুত্রকে মাতা প্রতিভাদেবী যদি কোনদিন কিছু বলেন, পিতা মায়ের উপরই রুষ্ট হয়ে ওঠেন। প্রথম সন্তানের প্রতি এত বেশী পৈত্রিক মমতা প্রায়ই দেখা যায় না। কনিষ্ঠ সন্তানরাই সাধারণতঃ পিতামাতার আদর স্নেহ অন্যদের তুলনায় বেশী মাত্রায় পায়। কিন্তু বড় ছেলে মধুকে কেউ কিছু বলতে পারে না।

বাড়ীতে যখন দ্বিতীয় সন্তানের আবির্ভাব হয়েছিল, আত্মীয়-স্বজন বিশেষ খুশী হয়নি। কারণ পুরুষপ্রধান সমাজে প্রায় সব পিতামাতাই মনে মনে পুত্রসন্তান কামনা করেন। ছেলে বংশগতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখবে শুধু এই আশায় নয়, সে একদিন

অর্থোপার্জনেরও যোগ্যতা অর্জন করবে। পিতামাতা যখন জরা ও বার্ধক্যে কর্মশক্তিহীন হয়ে সকলের করুণার পাত্র হয়ে পড়বে, তখন যদি যোগ্য পুত্র থাকে, তারা তাদের বাপ-মাকে দেখবে। নিজের রক্তের গড়া ছেলে আর মেয়ে। তবু ছেলের জন্য আকুতি, ছেলে হলে বেশী আনন্দ—এই পক্ষপাতপূর্ণ মনোভাবের পিছনে মা-বাপের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যত আশা সুপ্ত থাকে, এই কথা তাঁদের অনেকে স্বীকার করতে চাইবেন না। তবু এর মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, অন্তরে অন্তরে তা খুবই সম্ভবতঃ তাঁরা উপলব্ধি করবেন।

মেয়ে আর ছেলে জন্মালে হিন্দু লোকাচার-মতে মেয়েরা যে উলুধ্বনি দেয় তার মধ্যেও বিভিন্নতা আছে। যখনই পাশাপাশি বাড়ীর মেয়েরা পর পর পাঁচবার উলু দেবে, বোঝা যাবে যে সেই বাড়ীতে একটি ছেলে জন্মালো। উলুদাত্রী মেয়েরা বলাবলি করবে, বেশ ভালই হল। আহা, ছেলেটি ওদের দীর্ঘ আয়ু নিয়ে বেঁচে থাকুক। আর যখনই শুনবে মাত্র তিনবার উলু দিয়েই মেয়েরা থেমে গেল, তখন আলোচনা করবে পরিবারের মেয়েরা, এল ওদের ঘরে আর একটি মেয়ে। এই শিশুর আবির্ভাবে মেয়েরা, মায়েরা, বোনেরা—নারীজাতির কেউ যেন সুখী নয়। অবহেলিতা, অবনমিতা দু'টি অন্ন আর বস্ত্রের জন্য পুরুষের করুণাশ্রিতা আমাদের তখনকার দিনের মেয়েরা নিজেদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার কথা ভেবেই হয়ত এক নিষ্পাপ, সুন্দর কন্যাসন্তানের আবির্ভাবকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে পারতেন না।

এই পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান যে কেবল মেয়ে তাই নয়। মেয়ের গায়ের রং আমাদের এই গরম দেশে আজও তার ভবিষ্যত জীবনগতি নির্ধারণের পক্ষে এক পরম মূলধন। তাই যখন দেখা গেল মেয়ে কালো হওয়ায় আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শী সবাই তা নিয়ে

দুঃখ প্রকাশ করছেন, নামকরণের সময় মেয়েটির এক আদুরে নাম রাখলেন তার মা।

তিনি বললেন তাঁর স্বামীকে, আমার কালো মেয়ে দেখো একদিন তোমাদের সবার মুখ আলো করবে।

বলেই ছোট কাঁথায় জড়ানো এই নূতন মানুষটিকে মা বুকে নিয়ে চুমু দেন।

ক্রমে মেয়েটি বড় হয়ে ওঠে আর মায়ের দেওয়া ডাক নাম রাণী নামেই তাকে সবাই ডাকতে থাকে।

শহরের ডাঃ খাস্তগীর উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণী থেকে রানী প্রতি শ্রেণীতেই প্রথম তিন স্থানের একটিতে থেকে সকলের স্নেহ ভালবাসা পায়।

বড়ভাই একদিন বিকালবেলা বাইরে থেকে এসে উত্তেজিতভাবে তার মাকে বলে, সাংঘাতিক ব্যাপার—পাহাড়তলী রেলওয়ে কারখানার লোকদের বেতন নিয়ে যাচ্ছিল সতের হাজার টাকা। বেলা সাড়ে এগারটায় নাকি চারজন ডাকাত পিস্তল মেরে ঘোড়ার গাড়ী থামিয়ে, সঙ্গের পাহারাদার বন্দুকওয়ালা পুলিশ দু'টোকে কাবু করে ঐ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে 'টাইগার পাস' থেকে। এই আমাদের আসকার খানের দীঘির উত্তর পাড়ের রাস্তা দিয়ে তারা নাকি ঐ গাড়ী চালিয়ে এসেছিল। দুপুরে আমি তো দীঘির পাড়ের বেঞ্চে বসেছিলাম, আমি কিন্তু তাদের দেখতে পাইনি। এখন দেখে এলাম, খালি ঘোড়ার গাড়ীখানা পড়ে আছে ইসলামিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের পাহাড়ের নীচে রাস্তার উপর। কত লোক দেখছে, পুলিশ সাহেব, কত পুলিশ ওখানে!

মা শুনে বলেন, দিন দুপুরে এমন ঘটনা ত কোনকালে শুনিনি বাপু। তা গাড়ীটা তো পড়ে আছে, ডাকাতরা কোথায় গেল কিছু শুনেছিস্?

এমন সময় আপিস থেকে ফিরে এলেন পিতা। তিনি ঢুকেই শেষ প্রশ্নটা শুনেছেন। কাপড়চোপড় ছেড়ে তিনি প্রতিভাদেবীর হাত থেকে পাখাটি নিয়ে বারান্দায় রং-ওঠা পুরানো চেয়ারখানায় বসলেন।

রানী বড় এক ঘটি জল এনে দরজার গোড়ায় রেখে বলল, বাবা, স্কুলের প্রগতি-পত্র আজ দিয়েছে, তাতে একটা সই করে দিতে হবে। ওটা কাল ফেরত দিতে হবে।

বাবা বললেন, কত হয়েছিস এবার? প্রথম আছিস ত? নিয়ে আয় দেখি তোর সেই কাগজটা।

আগে হাতমুখ ধোও, কিছু খাবার খাও। পরে দেখো ওর কাগজ। সারা সন্ধ্যা, কাল সকাল পর্যন্ত সই করার সময় আছে—বলেই প্রতিভাদেবী উঠে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যান।

পিতাও খবর বলার জন্য উদ্‌গ্রীব, তিনি বললেন, যাচ্ছ তো, শুনেছ ত কাণ্ড। কী ভয়ানক সাহস ওদের! দিনের বেলায় সাড়ে এগারটায় এমন ব্যাপার। সিপাহীগুলোর কাছে নাকি টোটাভরা বন্দুকও ছিল। ও বেটাদের নাকি লাথি মেরে গাড়ী থেকে ফেলে দিয়েছে। ওদের একজন নাকি গাড়োয়ানকে নামিয়ে দিয়ে নিজেই গাড়োয়ান সেজে টাকার থলি আর তিনজন সাথীকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ী চালিয়ে এসেছে শহরে!

প্রতিভাদেবী স্বামীর কথা শুনে যেতে যেতে থেমে পড়েন। রানীও পাশে দাঁড়িয়ে সব শোনে চোখে জ্বলন্ত বিস্ময় নিয়ে।

সে জিজ্ঞাসা করে, বাবা, ঐ লোকগুলো এমনভাবে ডাকাতি করল, তাদের একটুও ভয় করল না?

বাবা বলেন, ডর-ভয় ওদের আছে নাকি? তারা দু'তিনটা পিস্তলের গুলী নাকি আকাশের দিকে ছুঁড়েছে, তাতেই বন্দুক-ওয়ালা সিপাহীগুলো ভয়ে কাবু। ওরা সাধারণ ডাকাত বলে

 সতের

আমার মনে হচ্ছে না। মনে হয় ওরা স্বদেশীর দলের হবে। ওরা ছাড়া এমন কাজ দিনের বেলা অন্যরা করতে পারবে না।

প্রতিভাদেবী বললেন, ওরা কি তাহলে ক্ষুদিরামের দলের লোক নাকি?

জবাব আসে, হতেও পারে। ওরা এ দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়াবার জন্য বোমা বানায় লুকিয়ে। পিস্তল, রিভলভার এসব চুরি করে কেনে। ভীষণ মানুষ ওরা, মরতে ভয় পায় না।

এ সময় পাশের দরজা দিয়ে খাস্তগীর স্কুলের হেডপণ্ডিতমশায় ঘরে ঢুকলেন। রানী গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলা নিতেই, তিনি তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বলেন, বেঁচে থাক প্রীতিলতা। জানেন জগদ্বন্ধুবাবু, আপনার মেয়ে এবার বাংলায় খুব ভাল করেছে, একেবারে প্রথম হয়েছে। রচনা ছিল, 'আমার জীবনের লক্ষ্য' এবং আরও তিন-চার বিষয়ে। প্রীতি লিখেছে জীবনের লক্ষ্য নিয়ে। বড় হয়ে সে নাকি মেয়েদের ভাল করে লেখাপড়া শেখাবার ও তাদের উন্নত করার জন্য তার জীবন উৎসর্গ করবে। রচনায় তাকে আমি কুড়িতে পনের দিয়েছি।

প্রীতি তখন লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন কি তার এই দরদী শিক্ষক ও পিতামাতা বুঝেছিলেন, এই মেয়ে ভবিষ্যতে শুধু মেয়েদের নয়, সমস্ত স্বাধীনতাকামীদের এক আদর্শস্থানীয়া, দেশপ্রেমিকা বীর-কন্যা হিসাবে অমর হয়ে থাকবে?

তার পিতার মুখ শিক্ষকের কথা শুনে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি প্রীতিলতাকে বলেন, যাও মা, তোমাদের পণ্ডিতমশায় আর আমার জন্য মুড়ি-নারকেল নিয়ে এসো।

সন্ধ্যার পরে ভাইবোনেরা মিলে যখন পড়তে বসেছে, দাদা মধু তখন আস্তে আস্তে বলে, জানিস রানী, সন্ধ্যার সময় দেখে এসেছি। বড় বড় ছাপানো কাগজ আঠা দিয়ে দেওয়ালে দেওয়ালে লাগিয়ে

দিচ্ছে। আমাদের গলির মুখে বরদাবাবুদের বাসায়ও একটা দিয়েছে। রেলের টাকা যারা ডাকাতি করেছে, তাদের ধরে দেবার জন্য সাহায্য করতে পারলে, অথবা ধরে দিলে দশ হা-জা-র টাকা পুরস্কার। জানিস্, দশ হাজার টাকা—এই ঘরে এত টাকা ধরবেই না। আমি যদি খবর পাই, ঠিক ধরিয়ে দেব। টাকা পেলে কিন্তু তোকে ঠিক আট আনা দিয়ে লাল ফিতা আমি কিনে দেব।

রানী মুখ ফুলিয়ে বলে, দরকার নেই আমার লাল ফিতা। তুমি ধরে দিতে যেও না। ওরা নাকি ক্ষুদিরামের দলের লোক। কি রকম যে আমার লাগে ঐ ক্ষুদিরামের ফাঁসীর গান শুনলে! সেদিন যে ঐ ভিখারীটা গেয়েছিল তুমি শোননি। আঠার বছরের ছেলে দেশের জন্য হাসতে হাসতে গলায় ফাঁসী পরল। এরা নিশ্চয় ডাকাত নয়, নিশ্চয় কোন ভাল উদ্দেশ্যে এসব কাজ করে।

মধু বলে, কচু ভাল কাজ। কি জানিস তুই? আমি খবর পেলেই হয়। ধোপাদের বাড়ীর সোনা আমাকে বলেছে, সেও থাকবে। কাপড় দিতে আর আসতে সে অনেক জায়গায় যায়। টাকা পেলে সে আর আমি আধাআধি ভাগ করব। তোর ফিতা না নিস তো বয়ে গেল। তা দিয়ে অন্দরকিল্লা থেকে অম্বুরি তামাক এনে খাব।

প্রীতিলতা রেগে গিয়ে বলে, বলে দেব এক্ষুণি বাবাকে যে তুমি তামাক খাও। আর ওদের খবর তোমার মত ছেলে আর সোনা পাবেই না। দিনের বেলাতে যারা এমন কাজ করতে পারে, তাদের এমন সাহস—শুনে আমার খুব ভাল লাগছে। আমি যদি ওদের খবর জানতাম, তাদের আমি বলে দিতাম যেন খুব সাবধানে ওরা থাকে, কেউ যেন তাদের ধরতে না পারে!

দূর থেকে ধমক আসে পিতার—কি হচ্ছে তোদের? পড়ার

শব্দ শুনছি না কেন তোদের ?

চেঁচিয়ে মধু আর প্রীতি পড়তে থাকে। ছোটবোন দু'টিও তাদের বই নিয়ে মাথা দুলিয়ে পড়ে।

তার মাসখানেক পরে আবার উত্তেজনা সারা শহরে। রেলওয়ে ডাকাতির লোকেরা ধরা পড়েছে। শহরের উত্তরে এক ভূতুড়ে বাড়ীতে নাকি ওরা এতদিন লুকিয়ে ছিল। পুলিশ কেমন করে খবর পেতেই ওরা চট্টগ্রাম-হাটহাজারী সড়কের পশ্চিমদিকে নাগরখানা পাহাড়ের ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢোকে। যাবার পথে যখন পিছন পিছন গ্রামের লোকজন, চৌকিদার আর পুলিশ পিছু যেতে সুরু করে, তখন ওরা নাকি এক থলি থেকে নূতন কড়কড়ে সিকি, আধুলি মুঠোয় মুঠোয় ওদের দিকে ছুঁড়ে দিতে থাকে। তার জন্য ভীষণ কাড়াকাড়ি সুরু হয় আর পিছনে ধাওয়া করা কিছুটা কমে যায়। তারপর শহর থেকে আরও পুলিশ এসে পড়ার আগেই ওরা নাগরখানা পাহাড়ের ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সেখান থেকে ওরা পুলিশের দিকে গুলী ছুঁড়তে আরম্ভ করে। পুলিশদের কয়েকজন গুলীতে আহত হয়। স্বদেশীদের মধ্যে আহত দু'জনকে পুলিশ ধরে নিয়ে আসে, অন্যদের পায় না।

জানা গেল, আহত দু'জনের মধ্যে একজন উমাতারা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক সূর্য সেন। আগে নন্দনকাননে হরিশ দত্তের জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে তাঁর বেশ সুনাম হয়েছিল। অন্যজন পোর্ট আপিসের কেরানী অম্বিকা চক্রবর্তী।

শহরে তখন জানাজানি হয়ে গেছে বায়েজিদ বোস্তামীর আস্তানার পাশে নাগরখানা পাহাড়ে পুলিশ ও স্বদেশীদের মধ্যে গোলাগুলী চলেছে। তাই যখন দেখা গেল, সশস্ত্র পুলিশের একটা

দল হেঁটে আসছে কাতালগঞ্জের দিক থেকে বড় রাস্তা হয়ে দক্ষিণ দিকে শহরের দিকে এগিয়ে, তখন রাস্তার ধারে জমে উৎসুক মানুষের ভিড়।

ভিড়ের ভিতর থেকে গলা বাড়িয়ে আছে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের দল। কাছে আসতেই দেখা গেল একখানা গরুর গাড়ীর উপর এণ্ডির চাদর গায়ে দিয়ে ছুই হাঁটুতে মাথা গুঁজে শীর্ণদেহ একটি লোক বসে আছেন। পাশে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ একজন তাঁর ডান পায়ের আহতস্থান চেপে ধরে বসে রয়েছেন। গরুর গাড়ীর উপর পুলিশের এক হাবিলদার আছে। সে মাঝে মাঝে এই দুইজন বন্দীকে লাথি ঘুষি দিচ্ছে আর বলছে, 'বোল শালা, নাম বোল্'।

বন্দী দু'জন আঘাতে আঘাতে এলিয়ে পড়েন কিন্তু একটি কথাও বলেন না।

গরুর গাড়ী যখন রহমতগঞ্জের রাস্তা দিয়ে জে-এম-সেন হলের পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তখন রাস্তার পশ্চিমের বাসায় এক সহ-পাঠিনীর কাছে গিয়েছিল প্রীতিলতা। স্বদেশী ডাকাত ধরে আনছে শুনে অনেক ছেলেমেয়ের মত সেও জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে।

কুড়ি-পঁচিশজন সঙ্গীনওয়ালা বন্দুকধারী সিপাহীঘেরা গাড়ী-খানা তাদের সামনে এগিয়ে এল, সহপাঠিনীর যে ভাইটি উমাতারা স্কুলের ছাত্র, সে বলে উঠল—ঐ ত আমাদের মাষ্টারমশাই চাদর গায়ে বসে আছেন। উনি আমাদের অংকের মাষ্টার। তাঁকে কেন এমন করে নিয়ে আসছে?

শুনে সবাই সেদিকে তাকায় অবাক বিস্ময়ে। কোথায় দেখা যাবে, বিশালদেহ, ভীষণদর্শন রক্তচক্ষুবিশিষ্ট ডাকাত। তা না হয়ে এমন শান্ত সমাহিত, ধুতিচাদরপরা ভদ্রলোক—তার উপর স্কুলের মাষ্টার আর অন্য একজন মধুরকান্তি তরুণ।

প্রীতি তার সহপাঠিনী রেণুকে বলে—এমন করে একজন

মাষ্টারকে ধরে নিয়ে এসেছে ওরা। আহা, দেখ কেমন করে লাথি দিচ্ছে। ব্যথা পেয়ে তিনি পড়ে যাচ্ছেন। পাশের মানুষটি কে কি জানি? আমার কিন্তু ভাই খুব কষ্ট লাগছে। ভাল ভাল লোকগুলিকে কেন ওরা এমন কষ্ট দিচ্ছে!

রেণুর বাবা ডাক্তার। তিনি এই দু'জনকেই চেনেন। তিনি বললেন, পাশের ভদ্রলোক দেওয়ানপুরের অম্বিকা চক্রবর্তী। তিনি খুব ভাল লোক বলেই আমি জানি। ডাকাত ধরতে গিয়ে খুব নিয়ে এসেছে, এক নিরীহ মাষ্টার আর একজন সরকারী আপিসের কেরানী।

প্রীতিও কেরানীর মেয়ে। ব্যথাভরা মনে সে তার জামালখাঁর বাসায় ফিরে এল। এসেই তার মাকে বলল, জান মা, রেণুদের বাসা থেকে এই আমি দেখে এলাম। উমাতারা স্কুলের অংকের মাষ্টার আর আপিসের কেরানী একজনকে বন্দুকওয়ালা পুলিশরা গরুর গাড়ী করে নিয়ে গেছে। এমন ভাল মানুষদের ওরা কেন ধরবে?

মা বলেন, তোমার বাবা একটু আগে এসে আমায় বলেছেন। সেই পাহাড়ে নাকি গোলাগুলী চালিয়ে আসল স্বদেশী ডাকাতরা সব চলে গেছে। টাকা পয়সা কিছু পাওয়া যায়নি। মাষ্টারবাবু ও তাঁর বন্ধু নাকি রবিবারে ছুটির দিন পেয়ে বায়েজিদ বোস্তামীর আস্তানায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। ডাকাত না পেয়ে কাজ দেখাবার জন্য পুলিশ ওদের ধরে এনেছে।

প্রীতি তার পড়ার টেবিলে তখন চুপ করে বসে থাকে আর ভাবে। কেন এমন হবে? যারা ভাল লোক, কোন দোষ করেনি, তাদের কেন ওরা ধরবে? তাদের গায়ে আঘাতও নাকি লেগেছে। কি জানি তাঁরা এখন কেমন আছেন? তার মার কাছে গিয়ে সে বলে—মা, চল না একবার আমরা তাঁদের খোঁজ

নিয়ে আসি রেণুদের বাসায় গিয়ে। রেণুর বাবার সঙ্গে কোতোয়ালী থানার দারোগার আলাপ আছে। পুলিশ গুলী চালিয়ে তাঁদের নাকি জখম করে দিয়েছে।

মেয়ের অনুভূতি মায়ের মনেও দোলা দেয়। কিন্তু স্বামী কম বেতনের কেরানী। যদিও তিনি মিউনিসিপ্যাল আপিসের কর্মচারী, তবুও সরকারের চাপ আছে সব জায়গায়। উনি একদিন বলেছেন, স্বদেশী কোন লোকের সঙ্গে একটুও সম্পর্ক আছে, তা টের পেলে নাকি তাঁর চাকুরী থাকবে না। অথচ এই চাকুরীই পরিবারের প্রধান অবলম্বন। গ্রামে তাঁদের কোন ধানের জমিও নেই।

তাই প্রতিভাদেবী বলেন—দেখ রানী, দুঃখ আমারও হচ্ছে। কিন্তু পুলিশ যখন তাঁদের ধরে এনেছে তখন ওরা তাঁদের থানার হাজতে অথবা জেলখানায় রেখেছে। আমরা কি করে তাঁদের খবর নেব? পরে খবরের কাগজে সব বেরোবে, তোমার বাবাও খবর শুনতে পাবেন, তখন সব আমাদের বলবেন।

প্রীতির শান্ত-শ্রী মুখখানিতে বেদনার গুরুভার। কিশোর মেয়েটি সংসারের এত জটিলতা বুঝতে চায় না। তার বড় ইচ্ছা হয়, ঐ আহত ভাল মানুষ দুজনকে একটু দেখবার। কিন্তু তা সম্ভব হবে না। তার উপর সে মেয়ে। সে জন্যও কোথাও গিয়ে একটুখানি সহানুভূতি দেখাবার সুযোগ তার নেই। সে ভাবে, যদি ছেলে হত স্কুল থেকে ফিরবার পথে ঘুরে খবর নিয়ে আসত।

সে শোনে কিছুদিন পরে তাঁদের মামলা শুরু হয়েছে চট্টগ্রাম কোর্টে। কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার চট্টগ্রামের দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর পক্ষ সমর্থন করতে এসেছেন চট্টগ্রাম। কোর্টে ঐ মামলা দেখার জন্য রোজ অনেক লোকের ভিড়। কাছাকাছি স্কুলের অনেক ছাত্রও তাদের দুপুর-ছুটিতে এই মামলা দেখতে আসে। সূর্য সেনের

অনেক প্রিয় ছাত্র দূর থেকেও তাদের প্রিয় শিক্ষককে একবার দেখবার আশায় আসে।

নির্বিকার দু'টি মানুষ আসামীর কাঠগড়ায়। ব্যারিষ্টারের তীব্র প্রশ্নজালে জর্জরিত সরকারী সাক্ষী, দারোগা ইত্যাদি যখন আবোল তাবোল বকতে থাকে, আসামীরা একটু একটু মুচকি হাসেন।

প্রীতির এক খুড়তুত ভাই রোজ মামলা দেখতে যেত। ঐ ভাইটি একদিন বিকালে তাদের বাসায় বেড়াতে এলে, সে মুড়ি খেতে খেতে প্রীতিদের কাছে মামলার গল্প বলতে থাকে। কি সুন্দর চেহারা ব্যারিষ্টারের। বিলাতে পাশ করা, আবার ১৯২২-এ চট্টগ্রাম রেলওয়ে ধর্মঘটের সময়, ধর্মঘটি শ্রমিক ও কর্মচারীদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা, তাদের জন্য তাঁর ঘরবাড়ী জমিজমা বন্ধক রাখা, তাঁর শহরের রহমতগঞ্জের বাসার বিভিন্ন ঘর ধর্মঘটিদের থাকার জন্য ছেড়ে দেওয়া, তারপর ইংরেজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম অমান্য করে শহরে মিছিল করার জন্য গ্রেপ্তার হওয়া—সব ঘটনা এই ছেলেটি বলে যায়। কলেজিয়েট স্কুলের দশম শ্রেণীর এই ছাত্র তার কয়েক বছর আগে থেকেই দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের গোপন দলের সদস্য। কিন্তু দলের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও গোপনীয়তার জন্য তার কথাবার্তা চালচলনে তা ধরবার কোন উপায় নেই।

প্রীতিলতা জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা দাদা, এই মামলার ফল কখন বেরোবে? ওঁদের কি রকম দেখলে? শরীর ভাল হয়ে গেছে? গায়ে নাকি গুলী লেগেছিল?

ছেলেটি বলে, এখন ত তাঁদের ভালই দেখলাম। কোর্ট থেকে পুলিশ তাঁদের হাতকড়া দিয়ে বেঁধে হাঁটিয়ে কয়েদীর গাড়ীতে উঠিয়েছে আমি দেখেছি।

প্রীতির মাও এসে বসেন তাঁর তরকারী কোটার বঁটি আর

তরকারী নিয়ে। তিনি বললেন, কোথায় পালিয়ে গেছে ডাকাত, আর মামলা চালাচ্ছে স্কুলের নিরীহ মাষ্টার আর একজন কেরানীর বিরুদ্ধে। তারা ছাড়া পেয়ে যাবে তোরা দেখিস।

মায়ের এই কথা শুনে প্রীতির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। ঐ সব মানুষগুলিকে সে চোখে দেখেনি। তবু নিরপরাধ মানুষের উপরে কেন অন্যায় অবিচার হবে? সে মনে মনে ঐ কামনাই করে। সে মাকে বলে, কেমন করে ব্যারিষ্টার সাহেব মামলা চালাচ্ছেন শোন না মা—পুলিশের সাক্ষীরা নাকি একেবারে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে।

প্রতিভাদেবী ঐ ছেলেটিকে আদর করে মনু ডাকেন। তিনি বলেন, দেখ মনু, যেদিন এর মামলার রায় দেবে, সেদিন স্কুল থেকে বাসায় ফিরবার পথে আমাকে বলে যাস। দেখিস, আমার কথাই ঠিক হবে, তাঁরা ছাড়া পেয়ে যাবেন।

আশার কথা শুনে প্রীতিও খুব খুশী হয়। সে দোলনা থেকে তার ছোট বোনকে নিয়ে আদর করতে করতে বলে, কি বলিস তুই, তাঁরা খালাস পাবেন ত।

রেলোয়ে ডাকাতি মামলায় সূর্য সেন আর অম্বিকা চক্রবর্তী বেকসুর খালাস হয়ে যান। জেল গেট থেকে অনেক আত্মীয়স্বজন ও ছাত্রযুবকরা তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসে।

প্রীতিদের স্কুলের প্রায় সব মেয়েই সরকারী অথবা আধা-সরকারী কর্মচারীর মেয়ে। তখন সে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। পড়ায় ভাল বলে শিক্ষিকা উষাদি তাকে বেশ আদর করেন। মাঝে মাঝে স্কুলের পাশে শিক্ষিকাদের হোষ্টেলে অন্যান্য কিছু ছাত্রীর সঙ্গে প্রীতিকেও তিনি ডেকে নিয়ে যান এবং দেশবিদেশের নানা গল্প করেন। ঐ মামলার কথা তিনি একদিন তুললেন। তাঁর বাড়ী

ঢাকায়। পড়াতেন ইতিহাস। তিনি তাঁর বেতের ঝুড়ি থেকে একটি টিনের কৌটা বের করে তা থেকে এক মুঠো করে চীনাবাদাম প্রীতিদের দিয়ে বললেন, রেলোয়ে ডাকাতির মামলার খবর শুনেছ তোমরা ?

সবার আগে জবাব দেয় প্রীতিলতা।

—শুনেছি, ঐ দু'জনই নাকি ছাড়া পেয়ে গেছেন। মা কয়েকদিন আগেই এ কথা বলেছিলেন। যারা দোষ করেছে ওরা নাকি তাদের ধরতেই পারেনি।

উষাদি হেসে বলেন, দোষ করেছে মানে ডাকাতি করে অপরাধ করেছে এই কথা ত ? কিন্তু দোষ কার, কে শাস্তি দেবে আর সেই বিচার কে করবে ? এই যে আমাদের স্বদেশ, এখানে আমরা কিভাবে আছি, কেন আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মানুষ না খেয়ে থাকে, শিক্ষা পায় না, রোগে ঔষধ পায় না, কারা এর জন্য দায়ী—এসব কথার জবাব জানতে হবে। তখন বুঝবে, দোষী কে, তার বিচারই বা কেমন করে হবে।

এমন করে উষাদি কথাগুলি বলেন, সাগ্রহে মেয়েরা তাঁর মুখের দিয়ে তাকিয়ে থাকে। তিনি প্রীতিকে ছোট একখানি বই পড়তে দেন, "ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই।" বলেন, এটা ভাল করে পড়ো, পরে আরও ভাল ভাল বই তোমায় পড়তে দেব। তোমার পড়ার বইতে এইসব ইতিহাস ঠিকভাবে লেখা নেই। সরকার পাঠ্য-বইতে সত্য ইতিহাস লিখতে দেয় না। তোমার পড়া হয়ে গেলে, অন্য মেয়েদেরও এই বইটি পড়তে দিও।

বাড়ীতে ফিরে এসে সন্ধ্যাবেলা পরের দিনের পাঠ্যবই কিছু পড়ে প্রীতি ঐ জীবনীখানা পড়তে সুরু করে।

এদিকে চট্টগ্রামে রেলোয়ে ডাকাতি এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আরও কিছু রাজনৈতিক ডাকাতি ও বিপ্লবীদলের

কার্যকলাপের ফলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে ১৯২৪-এ রাজনৈতিক কার্যকলাপে সন্দেহভাজনদের বিনাবিচারে আটক করার জন্য 'বেঙ্গল অর্ডিনান্স' নামে এক জরুরী আইন বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে উপস্থিত করে। প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে 'স্বরাজ্য পার্টি' পরিষদে ঐ আইনকে 'বে-আইনি আইন' আখ্যা দিয়ে এর বিরোধিতা করেন এবং তা পরিষদে পাশ হয় না। দেশবাসীর প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও বৃটিশ সরকার স্বৈরাচারী ক্ষমতাবলে সেই অন্যায় আইন পাশ করিয়ে নেয় এবং বিভিন্ন দেশভক্ত বিপ্লবী কর্মীদলের বিনাবিচারে আটক করতে সুরু করে।

তখন চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের শাখা ছিল দু'টি। একটির নাম ছিল "যুগান্তর" দল, অন্যটির নাম "অনুশীলন"। ১৯২১—২২-এ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন যে সারা পাক-ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে এক বিরাট বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল, তখন পর্যন্ত চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল একটিই ছিল। বিপ্লবীদের তখনকার কার্যকলাপ ছিল, প্রধানতঃ সরকারী বাজেয়াপ্ত রাজনৈতিক বই পড়া, ঐসব বই পড়িয়ে ছাত্র ও তরুণদের মধ্য থেকে দলের জন্য নূতন সদস্য সংগ্রহ করা, নৈতিক চরিত্র উন্নত রাখা, নিয়মিত-ব্যায়াম করা ইত্যাদি।

কিন্তু চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংযুক্ত এক যুবক প্রথম মহাযুদ্ধে [১৯১৪—১৮] প্রথম বাঙ্গালী সেনাদল "৪৯ নং বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট"-এর হাবিলদার হিসাবে চাকুরী করার পর যুদ্ধশেষে ফিরে আসার পর থেকে বিপ্লবীদলের মধ্যে আরও সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্য দাবী তোলেন। দলের উৎসাহী যুবক গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রভৃতিও কেবল গোপনে বইপড়া, গোপনভাবে সংগৃহীত দুই একটি অস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করা ও শরীরচর্চা করা নিয়ে তৃপ্ত থাকতে চাইছিল না।

এই ব্যাপারে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের নেতা ও প্রধান কর্মীদের এক বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হয়। বিপ্লবীনেতা সূর্য সেনের অধিনায়কত্বে তখন চট্টগ্রামে প্রথম 'যুগান্তর' দলের একটি শাখার সৃষ্টি হয়। এই দলে ছিলেন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, ধীরেন চক্রবর্তী, জুলু সেন ( ভাল নাম—সেন, যিনি ৪৯ নং বেঙ্গলী রেজিমেন্টের হাবিলদার ছিলেন), উপেন চক্রবর্তী। যুবকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, বিনয় সেন, মধু দত্ত, রাজেন দে, লোকনাথ বল ইত্যাদি। অনুশীলন দল চলতে থাকে অবিভক্ত দলের অন্যতম বিপ্লবী নেতা চারুবিকাশ দত্তের নেতৃত্বে। ঐ দলের প্রধান সদস্যরা ছিলেন গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী, প্রতাপ রক্ষিত, যশোদারঞ্জন চক্রবর্তী প্রভৃতি।

'বেঙ্গল অর্ডিনান্সে' চট্টগ্রাম থেকে বিপ্লবীদলের অনেক নেতা ও সদস্য আটক হয়েছিলেন। বিপ্লবীনেতা অম্বিকা চক্রবর্তী ও সূর্য সেন রেলোয়ে ডাকাতি মামলা থেকে মুক্তিলাভের পরে এই আইনে আটক হয়েছিলেন। সূর্য সেন থাকতেন শহরের দেওয়ানবাজার এলাকায় তাঁর এক নিকট-আত্মীয়ের বাসায়। একদিন ভোরে পুলিশ তাঁকে ধরার জন্য বাড়ীর তিনদিক ঘেরাও করে। বাড়ীটা ছিল মাটির দোতলা, মিউনিসিপ্যালিটির বড় নালার ধারে। নালার দিকটাতে পুলিশ যায়নি। কারণ সেদিকে ছিল বাড়ীর পিছন দিক। কিন্তু ক্ষীণদেহ অদ্ভুত এই মানুষটি ছাদে শুয়ে পূর্বদিকের জানালা দিয়ে যখন দেখলেন বাসার সামনে ও পাশে লালপাগড়ীর দল, সঙ্গে সঙ্গে নিজ কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। তিনি দোতলার পিছনের জানালা দিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির বড় নালার মধ্যে লাফ দিয়ে পড়লেন। নালায় প্রচুর বালি থাকায় শব্দ বিশেষ হল না। নালায় পড়ে তিনি সামান্য ব্যথা পেলেন। তবু নালা ধরে এগিয়ে গিয়ে

তিনি পশ্চিম দিকে উষার আবছা আলোয় নালা থেকে উঠে বর্তমান জে-এম--সেন-লেন ধরে পাহাড়ে গিয়ে উঠেন। পাহাড়ের ঝোপের ভিতর দিয়ে আরও উত্তরে দেবপাহাড়ে গিয়ে সেখান থেকে চট্টগ্রাম কলেজের উত্তর-পূর্ব কোণায় এক ছাত্র বিপ্লবী-সদস্যের বাসায় গিয়ে উঠতে পারেন। সেখান থেকেই বিপ্লবীনেতা সূর্য সেনের প্রথম বিপ্লবী জীবন স্নুরু হয়।

ঐ বিপ্লবী যুবকটি তখন চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র। শহরে বিপ্লবীদের যে চক্র, ঐ যুবকটি তখন তার ভারপ্রাপ্ত। দলের নেতার পলাতক জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, গোপনে একটি ঘরে তাঁর জন্য স্থান, পায়খানা ইত্যাদির ব্যবস্থা, নিয়মিত ভাত-তরকারী, সংবাদপত্র দেওয়া—সব তখন ঐ ছাত্রটিকেই করতে হত।

বিপ্লবীদলের যেসব গোপন বই ছিল তা রক্ষা করার দায়িত্ব তখন বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। "ক্ষুদিরাম", "কানাইলাল", "বাঘা যতীন", "দেশের কথা"* "সরকারী রাউলাট কমিশন রিপোর্ট" ইত্যাদি বই দলের সদস্যরা গোপনে পড়ত এবং গোপনে রাখার ব্যবস্থা করত।

২

চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলে তখন পর্যন্ত কোন মেয়ে সদস্য ছিল না। কেবল সচ্চরিত্র, স্বাস্থ্যবান ও সাহসী স্কুল ও কলেজের ছাত্রদেরই

* 'দেশের কথা'—লেখক মারাঠী ব্রাহ্মণ সখারাম গণেশ দেউস্কর। তিনি বাংলা দেশে এসে বাংলা শিখে এই বিখ্যাত বাংলা বইখানা লিখেছিলেন। ইংরেজ লেখক ডিগ্‌বীর লেখা বইয়ের এবং সরকারী বিভিন্ন দলিল থেকে বহু অকাট্য তথ্য সংগ্রহ করে তিনি লিখেছিলেন, কিভাবে ইংরেজ বণিক শাসকরা উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আমাদের দেশের মূল্যবান কাঁচামাল লুণ্ঠন করেছিল, ঢাকার মসলিনের যে জনপ্রিয়তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে

দলের সদস্য করা হত। দলের গোপনীয়তা এমন কঠোর ছিল যে, উর্ধ্বতন নেতা পরিচয় করিয়ে না দিলে, আপন সহোদর ভাই পর্যন্ত, সহপাঠী অথবা একই পাড়ায় বসবাসকারী ছাত্র বা যুবক যতই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ থাকুক না কেন, তারা যে গোপন বিপ্লবী দলের সদস্য, এ কথা প্রকাশ করা সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল।

অস্ত্রশস্ত্র, সাইকেল ও বইপত্র গোপনে রাখার যে ব্যবস্থা তা কেবল দলের ছাত্র ও যুবকদেরই করতে হত। দলের কঠোর নিয়মে অন্য মেয়ে দূরে থাক, নিকটতম আত্মীয়ের কাছেও সেসব কথা বলা বা জিনিসপত্র রাখা যেত না।

'বেঙ্গল অর্ডিনান্সে' বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরা ধরা পড়ে গেলে প্রীতিলতার সম্পর্কে-বড় ভাই ঐ কলেজের ছাত্রটি নিজের দায়িত্বে কিছু গোপন বই প্রীতির কাছে রাখার সিদ্ধান্ত করে।

তাদের বাসায় এক বিকালে এসে ছাত্রটি প্রীতির সঙ্গে কথায় কথায় বলে, রানী, আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবে তুমি? বাবা আমার বড় রাগী মানুষ। পড়ার বই ছাড়া অন্য বই পড়তে দেখলে চটে যান। কিন্তু দেশবিদেশের কথা, স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের কাহিনী আমার পড়তে খুব ভাল লাগে। তেমন ক'টা বই রাখতে পারবে? কিন্তু কাউকে বলতে পারবে না। অতি

---

বিস্তৃত হয়েছিল তাকে নষ্ট করার জন্য কেমন করে ঢাকায় মসলিন বুননের তাঁতীদের বুড়ো আঙ্গুল কেটে দেওয়া হয়েছিল, এই সব কথা। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল। তখন ইংরেজ সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করেছিল। তারপর বাংলার সকল বিপ্লবীদলের সদস্যের জন্য এই বইটি অবশ্যপাঠ্য ছিল এবং অন্যান্য বাজেয়াপ্ত রাজনৈতিক বইয়ের চেয়ে গোয়েন্দা পুলিশরা এই বইখানা খোঁজ করার জন্য বিশেষ তৎপর হত।

গোপনে রাখতে হবে, কেউ জানলে খুব ক্ষতি হবে।

বইগুলি যে সরকারী বাজেয়াপ্ত এবং পুলিশের হাতে যে ধরা পড়লে বিপদ হবে, এই কথা প্রীতিকে ছেলেটি বলল না। তাতে যে প্রীতি ভয় পেতে পারে শুধু সেই কারণেই নয়, প্রধানতঃ দলের কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্যেই বইগুলি সম্পর্কে ঐ প্রকৃত তথ্য প্রীতিকে বলা হয় না। তবু শেষের যে কথা, 'কাউকে জানালে খুব ক্ষতি হবে'—এইটুকুতেই যে-কোন কিশোর বা তরুণ মনে যে স্বাভাবিক ঔৎসুক্য জাগে, তার ফলেই প্রীতি জবাব দেয়, পারব না কেন ? মা আমাকে তাঁর পুরানো একটা ট্রাংক দিয়েছেন, তার মধ্যে আমি ওসব রেখে দেব। কেউ জানতেই পারবে না।

কয়েক দিন পরই কাগজে মোড়া একটি প্যাকেট ছেলেটি এনে প্রীতিকে দেয়। প্রীতি তা শাড়ীর আঁচলে ঢেকে ঘরের ভিতর গিয়ে তার বাক্সে লুকিয়ে রাখে।

স্কুলের লেখাপড়া, ঘরের নানা কাজ ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই প্রীতির মনে হয়, রাতে মা-বাবা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে একবার খুলে দেখবে ঐ মোড়কের মধ্যে কি আছে। তার দাদা তো তা খুলে দেখতে বারণ করেন নি, কেবল সাবধান করে দিয়েছেন, কেউ যেন না জানতে পারে বইগুলি তার কাছে আছে।

দ্বিধা ও সংকোচ তার গভীর ঔৎসুক্য আর উৎসাহের কাছে পরাজিত হয়। এক রাত্রে সবাই যখন ঘুমে অচেতন, তখন সে আস্তে আস্তে উঠে তার বাক্স থেকে ঐ কাগজের মোড়কটি হাতে নেয়। সারা দেহে তার রোমাঞ্চ। নিশ্চয়ই তার মধ্যে আছে বহু মূল্যবান কোন বই, যা পড়লে জানা যাবে স্বদেশের অনেক সত্য ইতিহাস। কারণ তার দাদার সঙ্গে স্বদেশীদের যে যোগাযোগ আছে, তা তার মা'র কাছে সে শুনেছে।

তার পড়ার টেবিলে গিয়ে ছোট করে রাখা হারিকেনটিকে সে

আর একটু বাড়িয়ে দেয়। তারপর ধীরে ধীরে কম্পিত হাতে মোড়কটি সে খুলে ফেলে। দেখে, তার মধ্যে আছে চারখানা বই, 'দেশের কথা', 'বাঘা যতীন', 'ক্ষুদিরাম' আর 'কানাইলাল'।

ক্ষুদিরামের ফাঁসীর গান কোন কোন বাউল ভিক্ষুকের কাছে প্রীতিলতা শুনেছে। গানের 'বিদায় দে মা ঘুরে আসি' কথাগুলির করুণ আকুতি যে-কোন শ্রোতার মত প্রীতির মনকেও গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। তাই প্রথমেই সে 'ক্ষুদিরাম' বইটি পড়তে সুরু করল।

মাসখানেকের মধ্যে ঐ বই কয়টি প্রীতি পড়ে শেষ করে ফেলল। তার ঐ দাদাটি এর মধ্যে কয়েকবার তাদের বাসায় এসেছে, কিন্তু বইগুলি সম্পর্কে তাকে কিছু বলেনি।

ঐ সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে সারা দেশের উপর গভীর শোকের ছায়া পড়ে। বেসরকারী স্কুলগুলিতে ঐদিন ছুটি দিলেও, সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েরা ছুটি পায় না। সেদিন বিকালে বাসায় ফিরে গিয়ে প্রীতি ও তার ছোট দুই বোন দেখে তাদের বড় ভাই বাসার পিছনে কুল গাছে চড়ে মনের আনন্দে কুল খাচ্ছে। ছোট বোনেরা চেঁচিয়ে ওঠে, দাদা, কুল দাও না আমাদের। হ্যাঁ, ভারি ইয়ে তুমি, একা একা স্কুল পালিয়ে সব কুলগুলো শেষ করছ।

বড়ভাই দু'চারটি কুল ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, ফাজলেমি করিস না। পালাব কেন? আমাদের ছুটি দিয়েছে, কলকাতায় বড়একজন নেতা মারা গেছে সেজন্য।

সেদিন বিকালে বেড়াতে এল বিপ্লবীদলের ঐ আত্মীয় ছেলেটি। তার হাতে সেদিনকার চট্টগ্রামের দৈনিক "পাঞ্চজন্য" পত্রিকা। তাতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনেক রকম ছবি, তাঁর জীবনী ও চট্টগ্রামে তাঁর আগমন, বিরাট সভা গান্ধী ময়দানে ইত্যাদির খবর

তাতে বিশদভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রীতিলতা তার দাদার কাছ থেকে ঐ পত্রিকাখানা ভাল করে পড়বার জন্য রেখে দিল।

প্রীতিদের বাসার দক্ষিণে বড় বড় আম, জাম, কাঁঠাল গাছ। তার ফাঁকে ফাঁকে শটির ঝোপ, জংলী কচুবন। নালার উত্তরপাড়ে তাদের বাসার দিকে আসাম লতার জঙ্গল। কাশফুল আর ঘেঁটুফুল অনেক রয়েছে ফুটে। শীতকাল সমাসন্ন বলে নূতন নূতন পাখীর দল আসতে সুরু করেছে। এখানে এলে শহরের কথা আর মনে থাকে না। গ্রামের শান্ত স্নিগ্ধ এক পরিবেশ মনকে আচ্ছন্ন করে।

এখানে একটা ঢিবির মত আছে। তাকে পরিষ্কার করে একটু বসবার জায়গা করা হয়েছে। প্রীতিলতা মাঝে মাঝে এখানে এসে বই নিয়ে বসে।

সেদিন শনিবার। স্কুল দেড়টায় ছুটি হয়েছে। স্কুল থেকে ফিরে আসার পর প্রীতি যখন তার প্রিয় ঐ স্থানটিতে বসে বসে একখানা বই পড়ছিল, তখন তার সেই আত্মীয় ভাইটি বাসায় তাকে না পেয়ে ওখানে গিয়ে হাজির হল। কারণ মাঝে মাঝে প্রীতি যে এখানে এসে আশ্রয় নেয়, তা সে জানত।

খুব মন দিয়ে প্রীতি একখানা বই পড়ছিল। তাই কারও আগমন সে লক্ষ্য করতে পারেনি। পিছন থেকে ছেলেটি বইটির নাম দেখে বলে উঠল,

রানী, এই বুঝি তোমার পড়া হচ্ছে ?

চম্‌কে উঠে প্রীতি বইখানা লুকিয়ে ফেলে। তারপর জবাব দেয়, এই একটুখানি দেখছিলাম, কেউ দেখতে পায়নি। দাদা তুমি রাগ করো না। খুব ভাল করে লুকিয়ে রাখি আমি। এই দেখ, পড়ার বই ইতিহাসটিও সঙ্গে এনেছি। তা ছাড়া মা জানেন যে, পড়ার জন্য মাঝে মাঝে এখানে আসি। আমার কাছে যে ক'টা বই তুমি রেখেছ, এইখানা ছাড়া আর সব আমার পড়া শেষ হয়ে

গেছে। 'বাঘা যতীন'টা পড়তে আমার এত ভাল লেগেছে কি তোমায় বলব। কেমন করে উড়িষ্যার সমুদ্রতীরে বালুর চরে গড় তৈরী করে বাঘা যতীন ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, মোটেই ভয় নেই। কী ভয়ানক সাহস আর বীরত্ব।

ছেলেটি তার ছোট বোনটিকে খুবই স্নেহ করে তার সততা আর গভীর আন্তরিকতার জন্য। কিন্তু দলের নিয়ম ছিল অত্যন্ত কঠোর। অতি নিকট আত্মীয়া ছাড়া অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে বেশী কথাবার্তা চলবে না। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সাহায্যে অথবা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী গোপন সংঘর্ষে ইংরেজ ও তাদের দালালদের হত্যা করা —দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করার এই যে কার্যক্রম, এর মধ্যে মেয়েদের কোন দরকার নেই। এই ছিল তখন পর্যন্ত দলীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত। তবু শহরের যত দায়িত্ব তখন প্রধানতঃ যাদের উপর, তাদের অন্যতম ছিল এই ছাত্রটি। দলের জরুরী বইপত্র রক্ষা করতে হবে এবং ঐ বৃহত্তর বিপ্লবী স্বার্থের জন্য দলের প্রধান নেতারা আটক থাকার সময়ে সে নিরাপদ স্থান হিসাবে তার ছোটবোনের বাক্সটিকে ব্যবহার করেছিল।

ঘরে গিয়ে ছেলেটি টেবিলের একপাশে বসে প্রীতিলতার ইতিহাসের বইখানা উল্টাতে থাকে। বইয়ের ভিতর থেকে একখানা ছেঁড়া পাতা মাটিতে পড়ে গেলে প্রীতি তাড়াতাড়ি তা উঠিয়ে নিয়ে বলে, দেখ দাদা, এই ছবিটা কার তা তুমি নিশ্চয় জান। তোমার বইগুলো পড়বার আগে থেকে আমি ইতিহাসে এঁর কাহিনী পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেছি। ষাট-সত্তর বছর আগে এই ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই কেমন করে খোলা তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁর সৈন্যদের ডাক দিয়েছিলেন, "মেরী ঝান্‌সী নেহী দেংগী"। আচ্ছা দাদা, লক্ষ্মীবাইকে তোমার খুব ভাল লাগে না?

ভাইটি মুগ্ধনেত্রে তার দেশ-দরদী বোনটির দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনছিল। জবাবে সে বলল,

কেন ভাল লাগবে না? ইংরেজ শোষক ও শাসকদের তাড়াবার জন্য ৭৫৭তে রাজশাহীর রানী ভবানী আর তার একশত বছর পরে এই রানী লক্ষ্মীবাই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

শুনে প্রীতির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বইখানা বন্ধ করে রেখে গভীর আগ্রহে সে বলে, এতকাল আগে থেকে মেয়েরা যদি দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়তে পারে, তা' হলে আমি কেন পারব না? আমার খুব ইচ্ছা করে ওদের মত হতে। বল না, কেন আমি পারব না? তা'ছাড়া তোমরা সবাই ত আমাকে "রানী" বলে ডাক। নাটোর আর ঝাঁসীর রানী যা পেরেছিল, চাটগাঁর রানী নিশ্চয় তা পারবে।

এই কঠিন প্রশ্নের জবাব ছেলেটি তখন দিতে পারে না। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা বিপ্লবীদলের। তাই নিয়ম-শৃঙ্খলা ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা তাদের মেনে চলতে হয়। একটি ইংরেজী প্রবচন ছাত্র ও তরুণ বিপ্লবীদের কাছে অতি প্রিয়। বাংলায় তার অর্থ হল 'কর্ম আর মৃত্যু চাই, প্রশ্ন করার কিছু নাই।' এটা বিপ্লবীদলের ছেলেদের খাতায় সুন্দর করে লেখা থাকে। তারা মনে প্রাণে তা বিশ্বাস করে, নিজেকে সেজন্য তৈরী করার চেষ্টা করে।

তাই ছেলেটি বলে, না রানী, বইগুলো তুমি পড়েছ ক্ষতি নেই। কিন্তু ঐ রকমভাবে যুদ্ধ করা এখন মেয়েদের দিয়ে চলবে না। মেয়েরা টাকাপয়সা, অলঙ্কার দিয়ে, গোপনে বইপত্র ও অস্ত্রকিছু রাখা—এভাবে স্বাধীনতার যোদ্ধাদের সাহায্য করতে পারে। এই বইগুলো যে তুমি পড়েছ, তা কোনদিন কাউকে বলো না, খুব ক্ষতি হবে আমার। আজ আমি উঠি, খুব সাবধানে রাখবে বইগুলি।

প্রীতি পরে বইগুলি এনে আবার সাবধানে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু বার বার তার মনে একটি প্রশ্ন জাগে—যুদ্ধ করা কেন মেয়েদের দিয়ে চলবে না ?

ক্রমে তার ম্যাট্রিকের ফল প্রকাশিত হয়। প্রথম বিভাগে পাশ করার পর ঢাকার ইডেন মেয়ে-কলেজে তাকে পড়তে পাঠানো হয়। কারণ ছাত্রীনিবাসের মাসিক থাকাখাওয়া খরচ তখন লাগত মাত্র দশ টাকা। এর মধ্যে তার এক বিবাহের প্রস্তাব আসে। কিন্তু তার প্রবল আপত্তি, সে আরও লেখাপড়া করবে, বিয়ে এখন কিছুতেই করবে না। পিতার খুব আগ্রহ, কারণ তাঁর মতে বংশ ও কুলের বিচারে তেমন ছেলে নাকি সহজে তাঁর মেয়ের মত শ্যামাঙ্গীর জুটতে পারে না। মেয়ের আপত্তি দেখে মাও বিয়ের ব্যবস্থা তখনকার মত স্থগিত রাখার কথা বলেন। স্থির হয়, আই-এ পাশ করুক, তখন দেখা যাবে।

ঢাকায় যখন প্রীতি পড়তে গেল, তখন ঢাকায় 'শ্রীসংঘ' নামে একটি বিপ্লবী দল ছিল। এই দল প্রকাশ্যে লাঠিখেলা, কুস্তি, ডন-বৈঠক, মুষ্টিযুদ্ধশিক্ষা ইত্যাদির জন্য ক্লাব, আখড়া ইত্যাদি ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় তৈরী করেছিল। সেখান থেকে বেছে বেছে ভাল ছাত্র ও তরুণদের তারা গোপন বিপ্লবীদলের সদস্য করত।

অবশ্য চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলেরও ব্যায়ামাগার বা ক্লাব ছিল। চট্টগ্রামের প্রধান বিপ্লবী নেতারা যখন 'বেঙ্গল অর্ডিনান্সে' আটক হয়ে গেলেন, তখন শহরের তরুণ ও ছাত্র বিপ্লবীদের উদ্যোগে সর্বপ্রথম ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের পশ্চিমদিকে অবস্থিত দেবপাহাড়ে। পরে ক্লাবটি চন্দনপুরায় ঐ কলেজের উত্তর-পূর্ব কোণায় এক প্রশস্ত খালি মাঠে স্থানান্তরিত হয়েছিল। বিপ্লবীনেতারা ১৯২৭ থেকে মুক্ত হওয়া সুরু হলে, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বলের উদ্যোগে সদরঘাট ক্লাব

প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তিনজন নেতা মুষ্টিযুদ্ধ, জাপানী যুযুৎসু, বিভিন্ন ধরণের ব্যায়ামকৌশল, ছোরাখেলা, লাঠিখেলা ইত্যাদিতে দক্ষ ছিলেন। শহরের সর্বপ্রধান ব্যায়ামাগার সদরঘাট ক্লাব ও চন্দনপুরা ক্লাবের ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে ঐ তিনজন বিপ্লবীনেতা নিয়মিত শিক্ষা দিতেন।

ঢাকার শ্রীসংঘের একটি মহিলা-শাখাও ছিল। তার নাম ছিল 'দীপালী সংঘ'। এই সংগঠনের নেত্রী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, লীলা নাগ (বিবাহের পরে লীলা রায়)। এই সংঘের প্রকাশ্য কাজ ছিল নারী শিক্ষা ও উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। এই সংঘের নেত্রী লীলা নাগের প্রচেষ্টায় ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় কয়েকটি উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় তখন স্থাপিত হয়েছিল। এই সংঘ 'শ্রীসংঘের' নেতৃত্বাধীনে গোপনে মেয়েদের বিপ্লবী সংগঠন তৈরী করত।

ইডেনে পড়ার সময় প্রীতিলতার ব্যবহার ও লেখাপড়ায় তার গভীর একাগ্রতা লক্ষ্য করে, ঐ মেয়ে কলেজেরই এক অধ্যাপিকা তাকে 'দীপালী সংঘে'র সদস্যা করার পরিকল্পনা করেন। প্রীতিলতা যখন গরমের ছুটিতে চট্টগ্রাম ফিরছিল, তখন এই অধ্যাপিকা তার সঙ্গে 'দীপালী সংঘে'র লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে অনেক আলাপ করার পরে, সংঘের সদস্যা হওয়ার জন্য তাকে একটি 'ফর্ম' দেন।

বাড়ীতে ফিরবার পরই সে বিপ্লবীদলের সদস্য তার সেই ভাইটিকে খবর দেয়।

পরদিন ভাইটি এলে প্রীতিলতা তাকে বলে, দাদা, এক মজার খবর দেবার জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

—বেশ কথা, ঢাকা থেকে আসবার সময় লোকে নিয়ে আসে ভাল ভাল খাবার আর তুমি এনেছ শুধু খবর।

খাবারও পাবে। মা'র কাছে আছে, উনি ঘুমিয়ে উঠলে

পাবে। তার আগে খবরই শোন।

প্রীতি উঠে তার ট্রাংক খুলে কাপড়-চোপড়ের তলা থেকে ভাঁজ করা একখানা হলুদ রং-এর কাগজ এনে ছেলেটির হাতে দিল। তারপর বলল, ঢাকার "দীপালী সংঘের" সদস্যা হবার জন্য তারা গোপনে এই ফরম পূরণ করে নিয়ে যেতে বলেছে। ছুটির পরে যাবার সময় নিয়ে যাব বলে এনেছি। শর্ত একটি লক্ষ্য করছ তো 'প্রয়োজন হইলে দেশের মুক্তি-সংগ্রামে আমার সর্বস্ব, জীবন পর্যন্ত আমি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি'। এটা কিন্তু আমার খুব ভাল লেগেছে। তুমি আমাকে বলেছিলে আমরা মেয়েরা নাকি ওসব পারব না। এখন কি বল তুমি?

—এই সম্পর্কে বড়দের সঙ্গে আমাদের আলাপ করতে হবে। আমার মনে হয় মেয়েদের এই রকম আলাদা সংগঠন থাকা ভালই হবে।

তারপর ছেলেটি ঐ হলদে রং-এর কাগজখানা নিয়ে মন দিয়ে পড়তে থাকে। পরে সে কাগজখানা ভাঁজ করে পকেটে নিয়ে বলে, সে ওখানা তাদের প্রধান নেতাকে দেখাবে এবং কয়েকদিন পরে তাঁর মত জানিয়ে তাকে ফেরত দেবে।

এই সময় "বেঙ্গল অর্ডিনান্সে" বিনাবিচারে আটক নেতারা ক্রমে ক্রমে মুক্ত হয়ে নিজেদের জেলায় ফিরে আসছেন। প্রধান বিপ্লবী নেতা সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ইত্যাদি নেতা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পরে প্রায় দুই বছর পরে আবার মিলিত হয়েছেন।

তাঁরা ফিরে আসার পর দলের কর্মীদের মধ্যে নূতন উৎসাহ ও শক্তি সঞ্চারিত হল। দলের সংঘবদ্ধতা ও সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রাম শহরের সদরঘাট ও অন্যান্য এলাকায় ব্যায়াম, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি শিক্ষা দেবার জন্য ক্লাব বা ব্যায়ামাগার

প্রতিষ্ঠিত হল। এই সমস্ত আশু কাজ এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সাহায্যে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য প্রচুর অর্থের দরকার। এই অর্থ কোন্ পদ্ধতিতে সংগৃহীত হবে, নেতারা ফিরে আসার পরে তা নিয়ে আবার বিশেষভাবে আলোচিত হয়। পূর্বে ধনী মহাজনদের গৃহে অথবা সরকারী অর্থ ডাকাতি করে বিপ্লবী কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু দলের নেতা ও কর্মীদের এক বড় অংশ ঐ পদ্ধতির বিরোধিতা করলেন। তাঁরা বললেন, স্বাধীনতার সংগ্রামীদের জন্য ডাকাতির অপবাদ লাভ একদিকে যেমন অসম্মানজনক, অন্য-দিকে ডাকাতির মামলায় যারা ধরা পড়ে, তাদের মামলা পরিচালনায় যথেষ্ট খরচ ও অসুবিধা হয় এবং যদি কারাদণ্ড হয়ে যায়, তখন কারাভোগেরও অযথা অপমান ও শক্তিক্ষয় হয়।

আলোচনায় স্থির হয়, বিপ্লবীদলের পক্ষ থেকে আর ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ ভবিষ্যতে করা হবে না। দলের সদস্যরা নিজ নিজ পরিবার থেকে অর্থ ও সোনার অলংকার সংগ্রহ করে দলীয় অর্থভাণ্ডারে দেব। নিজ নিজ মা-বোনদের কাছ থেকে দলের সদস্যরা দেশের মুক্তি-সংগ্রামের জন্য যখন ঐসব চাইবে, অনেকে স্বেচ্ছায় দেবেন। সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন এই মত বিশেষভাবে সমর্থন করে বলেন, তেমনভাবে যদি আলোচনা ভাল করে করা যায়, তাঁদের মধ্য থেকে অনেককে পাওয়া যাবে, যারা বিপ্লবের অন্যান্য কাজেও গোপন সাহায্যকারিণী হতে পারবেন। এই সম্পর্কে তিনি যে গভীর আশাবাদী এ কথাও তিনি তাঁর সহযাত্রী-দের সেদিন বলেছিলেন।

প্রীতির যে আত্মীয় ভাইয়ের কথা আগে উল্লেখিত হয়েছে, সে ঐ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিল। কিছুদিন পরে সে সর্বাধিনায়কের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করে।

তখন দেওয়ান-বাজারে চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেস কমিটির আপিস ছিল। বিপ্লবী সূর্য সেন ছিলেন জিলা কংগ্রেসের সম্পাদক। সেই আপিসে তাঁর সঙ্গে থাকতেন অন্যতম বিপ্লবী নেতা ও তদানীন্তন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সদস্য অম্বিকা চক্রবর্তী।

নির্ধারিত সময়ে সূর্য সেনের সঙ্গে ঐ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছেলেটি তার নিজ দায়িত্বে তাঁর আটক অবস্থায় অনুপস্থিত থাকাকালে প্রীতিলতার কাছে বাজেয়াপ্ত বই রাখা, প্রীতির সঙ্গে তার বিপ্লবী কাজে যোগদান সম্পর্কে আলোচনা এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি, "দীলিপ সংঘের" সদস্য হওয়ার ব্যাপারে প্রীতির কর্তব্য কি হওয়া উচিত—এইসব বিষয় বিস্তারিতভাবে বলে। দীর্ঘ আলোচনার পরে সূর্য সেন বলেন,

মেয়েদের সম্পূর্ণ বাদ দিয়েই এদেশে বিপ্লব হবে, একথা আমরা কোনদিন ভাবিনি। তবে দেশে মুক্তির জন্য যে কঠিন শত্রুর সঙ্গে আমাদের লড়তে হবে, সেখানে আছে রক্তপাত, অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষ, আরও অনেক কঠিন কাজ। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় মেয়েরা এইসব কাজে তোমাদের মত করে যোগ দিতে এখনই পারবে না। পরে অবশ্যই পারবে, তারা আমাদেরই মা, বোন তো। এখন থেকে আমাদের দলের ছেলেদের আপন বোন, মা ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের আমরা দলে নেব। কিন্তু তা করতে হবে খুব সাবধানে ও ধীরে ধীরে। বেশ কিছুদিন বইপত্র পড়বে, গোপনীয়তা রক্ষার মত যোগ্যা এবং সর্বোপরি উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারিণী হলেই তাদের কাছে দলের কথা বলা চলবে। হাল্কা বা চঞ্চল কোন মেয়ে সাময়িক উৎসাহের লক্ষণ দেখালেই তাকে বিশ্বাস করবে না এবং দলের কোন আভাসও তাকে দেবে না।

ছেলেটি সব শুনে বিনীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে,

তা' হলে প্রীতিকে কি বলব? তাকে কি দলের সদস্যা হিসাবে

গ্রহণ করা চলবে?

শুনে সূর্য সেন কিছুক্ষণ নীরবে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এই বিপ্লবীদলের তাঁকে সবাই ডাকে 'মাষ্টারদা'। বিপ্লবীদলের কাজে সর্বক্ষণের জন্য আত্মনিয়োগের পূর্বে রেলোয়ে ডাকাতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রামের চন্দনপুরায় অধুনালুপ্ত 'উমাতারা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে' শিক্ষকতা করতেন। সেজন্যই তাঁর সাথীরা তাঁকে 'মাষ্টারদা' বলে ডাকত। তাঁর অদ্ভুত চরিত্রবল, বিভিন্ন সংকটকালে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের আশ্চর্য দক্ষতার জন্য চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি সর্বসম্মত সর্বাধিনায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। গভীর শ্রদ্ধা ও আগ্রহে তাঁর অভিমত শোনার জন্য তাঁর তরুণ সাথী তাঁর দিকে চেয়ে থাকে। ধীর গম্ভীর কণ্ঠে মাষ্টারদা বললেন,

যে পবিত্র দেশপ্রেমের আদর্শ জীবনে আমরা গ্রহণ করেছি, তার জন্য আমাদের চরম আত্মদানের জন্য তৈরী হতে হবে। তার জন্য অন্য সব কিছুর সঙ্গে দরকার কঠোর সংযম। মা বোনেরা স্নেহ মমতা ও সেবা দিয়ে আমাদের যে সাহায্য করেন, সঙ্গে সঙ্গে কিছু দুর্বলতার বন্ধনেও তাঁরা আদের বাঁধতে চান। তাই যখনই সর্বস্বত্যাগের জন্য আমরা এগিয়ে যাই, স্নেহ-ভালবাসার অশ্রুজল নিয়ে আমাদের যাত্রাপথ তাঁরা আগলে থাকতে চান। তাই আমরা বিপ্লবীরা আজীবন কুমার থাকার ব্রত গ্রহণ করি। আমার পূজনীয় বড় ভাইয়ের কথা রাখার জন্য আমাকেও বিবাহ করতে হয়েছিল। কিন্তু তার পরদিনই সেজন্য আমার মনে অনুশোচনা আসে এবং আমি গৃহত্যাগ করেছিলাম। আমি যখন বোম্বাইয়ের রত্নাগিরি জেলে বিনাবিচারে আটক, তখন সম্পূর্ণ অপরিচিতা আমার স্ত্রীর টাইফয়েড হয়। জীবনে তার সঙ্গে একটি কথা বলার দরকার হয়নি। সে চিরবিদায় নেবার আগে নাকি বলেছিল, তাকে আমার আদর্শ-

পথের সাথী কেন করলাম না? তারপর থেকে আমি অনেক ভেবেছি। আমার মনে হয়, বিপ্লবের সব কাজে মেয়েদের না নিতে পারলেও, অনেক বিশ্বস্ত ও গোপনীয় কাজের সাহায্যের জন্য তাদের আমরা নিতে পারি। প্রীতির কথা তোমার কাছে শুনে আমি স্থির করেছি যে, তাকে আমরা দলে নেব। তবে সঙ্গে এই সিদ্ধান্তও থাকছে যে, তাকে আজ থেকে দলের সদস্যা করা হল। এই কথা তুমি, আমি ও সে—এই তিনজনের বাইরে কেউ যেন না জানতে পারে, এই আদেশ তোমার উপর রইল, তাকে একথা বলে দিও।

বিপ্লবী যুবকটি এই সিদ্ধান্ত জেনে বিশেষ আনন্দিত হল। এমন কথা তার মনেও অস্পষ্টভাবে অনেক সময় জেগেছে! জিজ্ঞাসা করল, প্রীতি কি ঢাকায় ঐ 'দীপালী সংঘের' সদস্যা হবে? তার কলেজে ফিরবার আগেই তাকে কিছু বলতে হবে।

মাষ্টারদা বললেন, সদস্যা হতে তার বাধা নেই। মেয়েদের ঢাকার ঐ সংগঠনের কথা আমার অজানা নয়। তাদের প্রধান নেতা অনিল রায় আমার পরিচিত। তাঁর সংগঠনের যিনি ভারপ্রাপ্তা সেই লীলা নাগের কথাও আমি শুনেছি। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত থাকলে মেয়েটির বেশ কিছু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা হবে। তবে সে যে আমাদের দলের সদস্যা হচ্ছে সে-কথা তাকে গোপন রাখতে হবে।

পরদিন যখন প্রীতিলতা জানতে পারলে যে, দলের সর্বাধিনায়ক তাকে দলের সদস্যা হবার অনুমতি দিয়েছেন তখন প্রথমেই সে তাদের পূজার ঘরে গিয়ে প্রণাম করল।

১৯২৯-এর অক্টোবর। তখন সূর্য সেন চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেসের সম্পাদক। সভাপতি ছিলেন ডাঃ মহিম দাস। হরিখোলা মাঠের উত্তর কোণায় তাঁর বাসা ছিল। সহ-সভাপতি ছিলেন ডাঃ অক্ষয় কুমার দস্তিদার। এই দু'জন ডাক্তারই ছিলেন তাঁদের

জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয়। শেষোক্ত চিকিৎসক আবার বিপ্লবীদলের গোপন সমর্থন ও যে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় অতি সহানুভূতিশীল সহায়। বিপ্লবীদলের প্রধান নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী ছিলেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সদস্য। বিপ্লবী নেতা নির্মল সেন, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বল জিলা কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির সদস্য। তখন বাংলার কংগ্রেসের মধ্যে দু'টি প্রধান দল। একদল চট্টগ্রামের দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং অন্যদল নেতাজী সুভাষ চন্দ্রকে সমর্থন করত। বিপ্লবী দলের মধ্যে যে দলটি "যুগান্তর" নামে পরিচিত, সূর্য সেনের নেতৃত্বাধীন চট্টগ্রাম বিপ্লবীদল ছিল তার সঙ্গে সংযুক্ত। এই বিপ্লবীদলের সদস্যরা সমর্থন করত সুভাষচন্দ্র বসুকে। অন্য বিপ্লবীদল "অনুশীলন" সমর্থন করত দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনকে। উভয় বিপ্লবীদলেরই গোপন সংগঠনের কাজ ও প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের কাজ একই সঙ্গে চলত। ঐ সময়ে সাংগঠনিক দিক থেকে চট্টগ্রামে "অনুশীলন" দল তুলনামূলকভাবে দুর্বল ছিল।

সূর্য সেন পরিচালিত বিপ্লবীদলের মধ্যে ঐ সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তটি অবশ্য উচ্চপর্যায়ের প্রথম চার-পাঁচ জনের মধ্যেই গোপন রাখা হয়েছিল। তা কার্যকরী করার প্রকাশ্য কাজ হিসাবে ব্যায়ামাগারে ছাত্র ও তরুণদের বিভিন্ন শারীরিক কৌশল, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি শিক্ষাদান একদিকে, আর এদের মধ্য থেকে গোপন বিপ্লবীদলের জন্য সদস্য নির্বাচন চলে অন্যদিকে। এই সব সদস্যদের ঘোড়ায় চড়া, মোটর চালানো এবং আরও বাছাই করা সদস্যদের নির্জন পাহাড়ে ও সাগরতটে রিভলবার ও পিস্তল-চালনা শিক্ষা দেওয়া হত।

আয়র্লণ্ডের বিপ্লবীনেতা ডি-ভ্যালেরা, ম্যাকসুইনি ইত্যাদি

ইংরেজ শাসনপাশ থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার জন্য যেভাবে 'রিপাবলিকান আর্মি' গঠন করে সশস্ত্র সংগ্রাম করতেন, সেভাবে এই দেশেও ঐ সংগ্রাম পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রেরণা চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা পেয়েছিলেন। প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের কাজ করলেও, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও অন্যান্য কাজে বিপ্লবীদলের অনেক নেতা ও কর্মী যোগ দিলেও, মনে মনে অহিংস উপায়ে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাবার কোন সম্ভাবনায় তারা বিশ্বাস করত না। তারা বিশ্বাসী ছিল সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং তার সাহায্যেই স্বদেশের স্বাধীনতা আসবে, আন্তরিকভাবেই এই কথা তারা বিশ্বাস করত।

তাই বাংলার অন্যান্য বিপ্লবীদলের সঙ্গে একটি সম্মিলিত কর্মপন্থা গ্রহণের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামের 'যুগান্তর' সমর্থক দলটি এক গোপন বৈঠকের আয়োজন করে। ১৯২৯-এর অক্টোবরে এই দলের উদ্যোগে চট্টগ্রাম যাত্রামোহন সেন হল প্রাঙ্গনে জিলা রাজনৈতিক সম্মেলন, জিলা যুব-সম্মেলন ও জিলা ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলন করা স্থির হয়। রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন নেতাজী সুভাষ-চন্দ্র বসু, যুব-সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক জ্যোতিশ ঘোষ এবং ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।

১৯২৯-এ প্রীতিলতা ঢাকা ইডেন বালিকা মহাবিদ্যালয় থেকে আই-এ তে মেয়েদের মধ্যে ১ম স্থান অধিকার করে বিশ টাকার বৃত্তি পায়। তার ফলেই তার মধ্যবিত্ত পিতা তাকে কলিকাতা বেথুন কলেজে পড়ার জন্য পাঠাতে পারেন। চট্টগ্রামে যখন ঐসব সম্মেলনগুলির আয়োজন চলছিল, তখন প্রীতি দুর্গাপুজার ছুটিতে বাড়ী এসেছে। কলিকাতার ছাত্রীনিবাসে থাকার সময় সে তার ব্যক্তিগত মধুর ব্যবহারে ও নানা কাজের মধ্য দিয়ে সে ছাত্রীদের

মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পূর্বসিদ্ধান্ত অনুসারে তার সঙ্গে কলিকাতায় বিপ্লবীদলের চট্টগ্রাম শাখার এক বিশিষ্ট কর্মীর সঙ্গে তার যোগাযোগ রক্ষিত হয়। তাকে বাজেয়াপ্ত বইপত্র পড়তে দিলে, সে নিজে পড়ে গোপনে অন্য ছাত্রীদেরও তা গোপনে পড়াতে থাকে। ক্রমে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলে চারজন মেয়ে ও অন্য কয়েকটি ছাত্রী নিয়ে প্রীতিলতা সেখানে একটি চক্র গঠন করে। এই চক্র থেকে প্রীতিলতা বিপ্লবীদের জন্য নিয়মিত অর্থসংগ্রহ করে বিপ্লবীদলে দিত। বিপ্লবীদলের পক্ষ থেকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থায় ব্যবহারের জন্য গোপনে কলিকাতায় গোপন কারখানায় তৈরী বোমার খোল আনার জন্য মেয়েদের ঐ চক্রকে নির্দেশ দেওয়া হলে, প্রীতিলতা ও অন্যান্য মেয়েরা তাদের নিজ নিজ ট্রাংক স্যুটকেসে লুকিয়ে কয়েকটি করে বোমার খোল এনে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের হাতে সফলভাবে পৌঁছে দিয়েছে। ১৯২৯-এ পূজার ছুটিতে চট্টগ্রাম ফিরবার সময় সব চেয়ে বেশী সংখ্যক খোল আনা হয়। ঐ চক্রের সদস্যা প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, সরোজিনী পাল, নলিনী পাল ও কুমুদিনী রক্ষিত প্রত্যেকে চারটি করে মোট কুড়িটি বোমার খোল তখন এনেছিল বলে জানা যায়। চট্টগ্রামের ১৯৩০-এর অস্ত্রাগার দখল ও পরবর্তী অনেক বিপ্লবী কার্যক্রমে ঐ খোলের বোমাগুলিই ব্যবহৃত হয়েছিল।

চট্টগ্রামে যখন উপরোক্ত সম্মেলনগুলির আয়োজন বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে চলছিল, তখন প্রীতিলতা ও তার কয়েকজন মেয়ে-সাথী একটি প্রস্তাব নেতৃবৃন্দের কাছে পাঠায়। তারা পত্রপত্রিকায় প্রচারিত সংবাদে দেখেছে, বাংলার অন্যান্য জেলায় নারীসম্মেলন হচ্ছে। তাই তারা অন্যান্য সম্মেলনের সঙ্গে জিলা নারীসম্মেলন অনুষ্ঠানের দাবী করল। সম্মেলনগুলির সাফল্যের জন্য চট্টগ্রামের দুটি বিবাদমান বিপ্লবীদল, 'যুগান্তর' ও অনুশীলনের

মধ্যে একটি সাময়িক আপোষ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল। তার ফলে সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে এই দুই দলের সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু সব কয়টি সম্মেলনের মূল নীতি নির্ধারিত হচ্ছিল সূর্য সেন ও তাঁর প্রধান সহকর্মীদের দ্বারা।

প্রীতিলতাদের প্রস্তাব শুনে প্রধান নেতা সূর্য সেন বলেন, 'নারী সম্মেলন হওয়া উচিত ঠিকই। কিন্তু তার আয়োজনের ভার মেয়েদেরই নিতে হবে। তা কি মেয়েরা পারবে? তারা সব ছাত্রী। কিছু বয়স্কা ও সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা যদি এ জন্য উদ্যোগী হন, তাহলে আমরা নারী সম্মেলনের জন্য এই সঙ্গেই ব্যবস্থা করতে পারি। একই সম্মেলন মণ্ডপে একদিন এই সম্মেলন আমরা করতে দেব। তার জন্য স্বেচ্ছাসেবিকা তাদেরই তৈরী করতে হবে। ঐ সম্মেলনের কাজে বাইরে থেকে যা করা দরকার তা করা হবে। সম্মেলনের সময়ে তার মধ্যে কোন পুরুষ সেখানে ঢুকবে না।'

তখন চট্টগ্রাম শহরের একমাত্র লেডী ডাক্তার ছিলেন মিসেস সুহাসিনী মুখার্জী। রহমতগঞ্জ ব্রাহ্মমন্দিরের পাশে তাঁর বাসা ছিল। তাঁর অন্য এক প্রতিবেশী ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত "নারায়ণ" পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন।

প্রীতিলতা ও অন্য কয়েকটি ছাত্রীর উদ্যোগে শ্রীযুক্তা চারুবালা দত্তগুপ্তার বাসায় মেয়েদের একটি সভা হয়। ঐ সভায় স্থির হয়, অন্যান্য সম্মেলনের সঙ্গে চট্টগ্রাম জিলা নারী সম্মেলনও হবে। মিসেস সুহাসিনী মুখার্জী ও শ্রীযুক্তা চারুবালা দত্তগুপ্তা এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির যুগ্মসম্পাদিকা নির্বাচিতা হন। সম্মেলনের সভানেত্রীর জন্য মনোনীতা হন তৎকালীন বিশিষ্টা মহিলা কংগ্রেস নেত্রী মিসেস লতিকা বোস, বি-এ (ক্যান্টাব)। তাঁর সম্মতি প্রার্থনা

করে কলিকাতায় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদিকারা এক জরুরী তার ঐদিনই পাঠান। পরদিনই মিসেস লতিকা বোসের সম্মতি এসে পৌঁছে।

পূর্বেই স্থির হয়েছিল যে, অন্যান্য সম্মেলনের সঙ্গে জিলা ছাত্র সম্মেলন হবে। তার জন্য নির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একসময়ে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এখানে কিছু বলা দরকার।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন স্রুরু হয়েছিল ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে। সরকারী চাকুরী ত্যাগ, ছাত্রছাত্রীদের স্কুল-কলেজ ও বিলাতী বস্ত্র বর্জন ঐ আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচী ছিল। কলিকাতা হাইকোর্টের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ ঐ আন্দোলনের ডাকে যখন তাঁর মাসিক দশ হাজার টাকা আয়ের আইনব্যবসা ত্যাগ করেন এবং তাঁর নিজের বসবাসের ও অন্যান্য কয়েকটি গৃহ জনসাধারণের কল্যাণের জন্য দান করে একখানা সতরঞ্চি পেতে রাস্তার ফুটপাতে বসে দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের কথা ঘোষণা করলেন, দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে "দেশবন্ধু" আখ্যায় ভূষিত করেছিল। চট্টগ্রামের যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তখন কলিকাতায় উদীয়মান তরুণ ব্যারিষ্টার। নিজ দক্ষতায় তিনি ক্রমে আইনব্যবসায়ে খ্যাতিলাভ করতে স্রুরু করেছেন। ঐ সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এসে রহমতগঞ্জে যতীন্দ্রমোহনের বাড়ীতে (বর্তমান বাংলা কলেজ ঐ বাড়ী ভাড়া করেছে) এসে উঠেছিলেন।

দেশবন্ধু চট্টগ্রামে এসেছিলেন কংগ্রেসের ডাকে, অসহযোগ আন্দোলন প্রসারের জন্য জনসভা করতে। জনসভার পূর্বে তিনি যতীন্দ্রমোহনের বাসায় গিয়ে সোজা প্রস্তাব দিলেন, যতীন্দ্রমোহনকেও ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করে এই আন্দোলনে

আত্মনিয়োগ করতে হবে। এই মহান দেশপ্রেমিক নেতার আহ্বানে সাড়া দিতে বিন্দুমাত্র দেরী যতীন্দ্রমোহন করেন নি। দেশবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে ঘাটফরহাদবেগ "গান্ধী ময়দানের" বিরাট জনসমুদ্রে উপস্থিত হলেন এবং উপস্থিত নেতা ও জনসাধারণের কাছে যতীন্দ্রমোহনের সংকল্প ঘোষণা করলেন।

সভায় তিলধারণের স্থান নেই। বর্তমানে যে 'কোহিনূর প্রেস' ও 'জেমিসন ম্যাটারনিটি হোম' এবং পরিত্যক্ত 'মোসলেম হল' আছে, এই সমস্ত জায়গা তখন খালি ছিল। সদর রাস্তা থেকে ঐ বিরাট স্থান, দক্ষিণে হাসপাতালের পাহাড় সব লোকে লোকারণ্য। চট্টগ্রাম শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সব হিন্দু মুসলিম পুরুষ যেন এসে জমা হয়েছে দেশবন্ধুর অনলবর্ষী স্বাধীনতার বাণী শোনার জন্য। হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে দেখা গেল স্বেচ্ছাসেবকরা একজন খদ্দরপরা ও গায়ে খদ্দর-চাদর জড়ানো একজন ক্ষীণকায় ব্যক্তিকে রাস্তা করে দিচ্ছে। ক্রমে তিনি যখন সভামঞ্চে গিয়ে হাজির হলেন, চট্টগ্রামের কংগ্রেস নেতা মহিম চন্দ্র দাশ, শেখ-এ-চাটগাম কাজেম আলী প্রমুখরা তাঁকে চিনতে পেরে বিস্মিত আনন্দে তাঁকে দেশবন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি সেখানে ঘোষণা করলেন, মাসিক সাড়ে সাত শত টাকা বেতনের সহ-অধ্যক্ষের চাকুরী তিনি ঐদিনই ত্যাগ করে সোজা সভায় চলে এসেছেন। তিনি আরও সংবাদ দিলেন, ঐদিন তাঁকে তখনকার দিনের সর্বপ্রধান সরকারী কলেজ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে সহ-অধ্যক্ষের পদে বদলীর আদেশ এসেছিল, তাও তিনি প্রত্যাখান করেছেন। জনসাধারণ তুমুল হর্ষধ্বনি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করে।

ঐ সময় দেখা গেল রাস্তার দিকে জনতার ভিড় ঠেলে আরও একজন সভামঞ্চের দিকে আসবার চেষ্টা করছে, কিন্তু অপরিচিত ঐ গরীব মানুষটিকে কেউ এগিয়ে যেতে দিচ্ছে না। লোকটি দূর থেকে চিৎকার করে বলে, মাষ্টারমশায়, আমি সারদা দফতরী। আপনার মত আমিও চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

ঐ কথা শুনে অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের ইসারা করলে, তারা সারদা দফতরীকে সভামঞ্চে যেতে দেয়। সে তখন এসে বলল, দেশের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য সেও মাষ্টারমশায় অর্থাৎ নৃপেন্দ্রনাথের মত তার মাসিক বার টাকা বেতনের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এসেছে, তখন সবার আগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উঠে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি বললেন, সাড়ে সাতশ' টাকা বেতনের চাকুরী ছাড়ার চেয়ে বার টাকার চাকুরী ছেড়ে আসা অনেক মহত্তর ত্যাগ—তাঁর ত্যাগের আদর্শ গ্রহণের জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানালে জনতা সোল্লাসে তাতে সমর্থন জানায়।

ছাত্র-সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে আমন্ত্রিত হলে অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব-স্মৃতিবিজড়িত চট্টগ্রামে নির্ধারিত তারিখের দুই-একদিন পূর্বেই এসে পৌছান। তিনি এসে লক্ষ্য করেন বিভিন্ন প্রাচীরপত্রে শহর ভূষিত। তার মধ্যে একটিতে তাঁর নামের সঙ্গে বড় বড় শিরোনামায় লেখা, "চট্টগ্রাম জিলা ছাত্র-সম্মেলন"। তিনি তা দেখে আপত্তি জানিয়ে বললেন, শুধু 'ছাত্র' কেন লেখা হয়েছে এখানকার স্কুল-কলেজে ছাত্রী অনেক আছে। ১৯২৬ থেকে চট্টগ্রামের সরকারী কলেজে সহ-শিক্ষা সুরু হয়েছিল। ডাঃ খাস্তগীর ও পাথরঘাটা উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা কম নয়। সমাজ ও পরিবারের বাধা ভেঙ্গে এখনও ছাত্রীদের

কেন এই সম্মেলনে আনবার চেষ্টা করা হবে না? তিনি প্রস্তাব দিলেন, নূতন প্রাচীরপত্র দিতে হবে, "জিলা ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলন"।

প্রীতিলতা ও অন্যান্য যেসব মেয়ে জিলা নারী সম্মেলনের দাবী তুলেছিল, তারা এই খবর জেনে খুবই আনন্দিত হল এবং উভয় সম্মেলনে যাতে ছাত্রী ও অন্যান্য মেয়েরা যোগ দেয় সেজন্য বিভিন্ন বাড়িতে প্রচারকার্যে লেগে গেল।

ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলনে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। বিষয় ছিল: "পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে"। ঐ বিতর্কে প্রথম দিকে কোন ছাত্রী যোগ দেয়নি। অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথের উৎসাহে ঐ বিতর্কের বিষয়বস্তুর পক্ষে যোগ দিয়েছিল প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, সরোজিনী পাল ও কুমুদিনী রক্ষিত। শেষোক্ত দুই জনই তখন বেথুন কলেজের ছাত্রী এবং প্রীতিলতার সঙ্গে বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটের ছাত্রী-আবাসে থাকত। গোপন বিপ্লবীদলের সমর্থকও তারা ছিল।

ছাত্রী ও নারী সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠন করার যে আয়োজন প্রীতিলতা ও অন্যান্য মেয়েরা করে, তার মধ্যে কল্পনা দত্ত তাদের সংস্পর্শে আসে। সেই বছর কল্পনা দত্ত ডাঃ খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কল্পনা দত্ত মাসিক পনর টাকা বৃত্তি পেয়েছিল। পরে সে কলিকাতায় বেথুন কলেজে আই-এস-সি-তে ভর্তি হয় এবং তখন পূজার ছুটিতে বাড়ী এসেছিল।

বিতর্কে ঐ চারজন ছাত্রী ছাড়া প্রায় আট দশ জন স্কুল ও কলেজের ছাত্র যোগ দিয়েছিল। তখনকার দেশপ্রেম প্রকাশের প্রধান কি ছিল, ইংরেজ-বিরোধিতা। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার মত লাভজনক ও কল্যাণকর দিকই থাকুক না কেন, তার বিরুদ্ধে বলার জন্যই ছিল বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীর। যেহেতু বিতর্ক করতে

হবে, পাঁচ ছয়জন ছাত্র বিষয়বস্তুর বিপক্ষে বলে। প্রীতিলতা ও সাথী মেয়ে তিনজন বিভিন্ন বই পত্রিকার সাহায্যে পাশ্চাত্যশিক্ষার ব্যর্থতা প্রতিষ্ঠার জন্য তৈরী হয়।

সম্মেলনের একদিন আগে কলিকাতা থেকে অন্যান্য নির্বাচিত সভাপতিরা আসছেন। কলিকাতা মেল চট্টগ্রাম রেল ষ্টেশনে সকালে এসে পৌছবে। ভোর থেকে প্রভূত জনসমাগম। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তদানীন্তন বাংলা ও ভারতের তরুণদের অত্যন্ত প্রিয় নেতা। হাজার হাজার হিন্দু মুসলিম ছাত্র তরুণ তাঁকে দেখবার জন্য উপস্থিত হয়েছে।

নারী সম্মেলনের সভানেত্রী মিসেস লতিকা বোসকে অভ্যর্থনা জানাতে গেছেন ডাঃ সুহাসিনী মুখার্জীর সঙ্গে প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত ও প্রায় কুড়ি পঁচিশজন মহিলা ও স্বেচ্ছাসেবিকা।

কলিকাতা মেল থামার সঙ্গে সঙ্গে জিলা রাজনৈতিক সম্মেলনের খাকী রং-এর খদ্দরের উর্দি-পরা 'জি-ও-সি' বিপ্লবী নেতা গণেশ ঘোষ এবং তাঁর সহকারী বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিংহ তাঁদের খাকী খদ্দরের সামরিক পোষাক পরিহিত শ'খানেক স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে ষ্টেশনে সমবেত জনতাকে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড় করালেন। ভিড়ের মধ্য দিয়ে যেই পথ তৈরী হল, তার মাঝখান দিয়ে সর্বপ্রথম এগিয়ে এলেন সুন্দরপুরুষ জনগণবন্দিত নেতা সুভাষচন্দ্র বসু।

প্রীতিলতা তাঁর সামনে গিয়ে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে প্রথম তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিল। আরও অনেক মালায় তিনি ভূষিত হলেন। তারপর মিসেস লতিকা বোস এগিয়ে এলে প্রীতিলতা ও অন্যান্য উপস্থিত সব মেয়েরা প্রত্যেকে একটি করে ফুলের মালা তাঁর গলায় দেয়। যুব-সম্মেলনের প্রৌঢ় বিপ্লবী নেতা অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ সবার পিছনে। ভাল করে তিনি হাঁটতে পারেন না। বিভিন্ন বিপ্লবী মামলায় জড়িত করে বিদেশী

সরকারের গোয়েন্দা পুলিশ তাঁর উপর এমন নির্মম নির্যাতন করেছিল যে, বহুদিন পর্যন্ত হাসপাতালে, শয্যাগত থেকে, অনেক চিকিৎসা সত্ত্বেও তিনি সুস্থ হতে পারেন নি। শরীরের কোন কোন অংশ তাঁর অবশ হয়ে যাওয়ায় তিনি ভাল করে হাঁটতে পারতেন না। ঐ রুগ্ন শরীর নিয়েও দেশপ্রেমের গভীর টানে তিনি যখনই কোন আন্দোলন, বিক্ষোভ অথবা সম্মেলনে যাবার সুযোগ পেতেন, সাগ্রহে তাতে যোগ দিতেন। সমবেত বিপ্লবীদলের ছাত্র ও তরুণরা তাই পরম নির্যাতিত এবং বিপ্লবী নেতাকে তাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে অভিনন্দন জানায়। প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত ও অন্যান্য মেয়েরা আনত হয়ে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করল।

ছাত্র-ছাত্রী ও নারী সম্মেলন তখনকার দিনের পক্ষে বিস্ময়কর ভাবে সাফল্য অর্জন করে। নারী সম্মেলনে কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার না থাকায় বেশ কিছু বোরখা-পরিহিতা মুসলিম নারীও ঐ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কুমুদিনী রক্ষিত প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। অন্য তিনজন ছাত্রীকে বিতর্কে পারদর্শিতার জন্য ঢাকার বিপ্লবী নেতা ও রাজনৈতিক লেখক নলিনীকিশোর গুহ প্রত্যেককে তাঁর স্বরচিত ছয়খানা করে বাংলা বই পুরস্কার দিয়েছিলেন।

এভাবে প্রীতিলতা বিপ্লবী দলের প্রকাশ্য কাজের সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। গোপন কাজের আরও দায়িত্বপূর্ণ 'কাজের ভার তার উপর দেওয়া হয়। সে ছাত্রীদের নিয়ে যে 'চক্র' গঠন করেছিল, তাদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য গোপন বাজেয়াপ্ত বই সে তাদের পড়াতে স্বরু করে। বিপ্লবী কাজে অর্থের প্রয়োজনীয়তা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে থাকে এবং দলের জন্য নিয়মিত অর্থসংগ্রহে সে বেশ

দক্ষ হয়ে ওঠে। কোন কোন মেয়ের কাছ থেকে মূল্যবান স্বর্ণালংকার দলের জন্য স্বেচ্ছায় দান হিসাবে সংগ্রহ করে দলের কাছে জমা দেয়।

প্রীতিলতার জীবনে ঐসময়ে এক নূতন ভাব জাগে। তখনকার সব বিপ্লবীরা খুবই ধর্মভীরু ছিল। বিপ্লবীদলের নিষ্ঠা, আনুগত্য ও বিশ্বাস সবই প্রধানতঃ ধর্মীয় অনুশাসনে গঠিত হয়ে উঠত। প্রীতিলতার পিতামাতার কাছ থেকেই সে ধর্মশিক্ষা পায়। বিপ্লবীদলের আসবার পরে তার ধর্মশিক্ষা ও বিপ্লবীচেতনার মধ্যে এক সমন্বয় ঘটে। সে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিঃস্বার্থ আত্মদানকে একটি পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে ভাবতে সুরু করে।

বিপ্লবীদলে তার যে বড় ভাইটি ছিল, সে একদিন প্রীতির কাছে রোজনামচা লেখার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করে। তখন বিপ্লবী-দলের অনেক সদস্যই রোজনামচা লিখত। তাতে লিখতে হত, প্রতিদিন বিপ্লবী কাজের জন্য কতটা সময় ব্যয় হল, কোন মিথ্যা কথা বলা হয়েছে কিনা, নৈতিক কোন দুর্বলতা এসেছিল কিনা এবং তাকে জয় করা হয়েছিল কিনা ইত্যাদি। এই সব রোজনামচা অনেক সময় দলের উর্ধ্বতন নেতারা পরীক্ষা করে দেখতেন। শিক্ষাদানের এই পদ্ধতির জন্য বিপ্লবীদলের সদস্যদের নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত দৃঢ় হয়ে গড়ে উঠত।

প্রীতিলতা তার রোজনামচায় একদিন লিখল,

"...কোন্‌পথে জীবনকে আমি ভাসিয়ে দিলাম? এই ত আমার টেবিলের সামনে রাধাকৃষ্ণের ছবি। এই প্রেম স্বর্গীয়। এমনভাবেই মাতৃভূমিকে আমাকে ভালবাসতে হবে। অন্য কোন প্রেম ভালবাসা আমার হৃদয়ে স্থান পাবে না। রাধার মতই আমার দেশপ্রেম আমি উজাড় করে ঢেলে দেব, নিজকে নিঃশেষে আমি দান করে যাব।"

খুব সম্ভবত ঐ সময় সে রাস্তার এক বাঁশীওয়ালার কাছ থেকে একটি বাঁশী কিনেছিল। একা একা বসে সে বাঁশী

বাজাত। ক্রমে বাঁশী বাজানোতে সে অনেকটা দক্ষ হয়ে ওঠে। কোন কোন সময় গভীর রাতে তার কলিকাতার ছাত্রী-নিবাসের খোলা ছাদে গিয়ে বাঁশী বাজাত। 'অনার্স' নিয়ে সে দর্শনশাস্ত্র পড়ত এবং বেথুন কলেজে সে ঐ বিষয়ে সর্বদা প্রথম হত। তার পাঠ্যবইয়ের মধ্যে সে পেয়েছিল 'বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।' বিপ্লবী সাহিত্য পড়ে, বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় তার বিশ্বাস হয়েছিল, সশস্ত্র বিপ্লবের পথেই দেশের মুক্তি আসবে। সেই বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করে সে নিজেকে গড়ে তুলেছিল এবং যখনই অন্য কোন চিন্তা তার মনকে আচ্ছন্ন করতে চাইত, বাঁশীর করুণ সুরের মধ্য দিয়ে সে তাকে ভাসিয়ে দেবার চেষ্টা করত। ঐ ছাত্রীনিবাসে তার চেয়ে বয়সে বড় ও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রী বিপ্লবীদলের সমর্থক সরোজিনী পাল অনেক রাতে তার বাঁশী শুনে ছাদ থেকে তাকে ধরে নীচে নামিয়ে আনতেন এবং নিজে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিতেন।

তারপর যে ঘটনা ঘটল, তার প্রভাবে কেবল প্রীতিলতার জীবনেই নয়, বাংলা ও ভারতের মুক্তিসংগ্রামের তদানীন্তন ধারায় এল এক প্রচণ্ড আলোড়ন।

১৯৩০-এর ১৯-শে এপ্রিল তারিখে প্রীতিলতাদের ছাত্রীনিবাসে তখনকার দিনের কলিকাতার বিশিষ্ট দৈনিক "নায়ক" পত্রিকার এক সান্ধ্যকালীন বিশেষ সংখ্যা উপস্থিত হল। সব মেয়েরা ভিড় করে ঐ পত্রিকাটির উপর ঝুঁকে পড়ল। গভীর বিস্ময় ও আনন্দে প্রীতিলতা দেখল, সারা প্রথম পাতা জুড়ে এক বিরাট শিরোনামা: "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল—টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন আপিস ধ্বংস—রিজার্ভ পুলিশ লাইন অধিকার।" এই অবিশ্বাস্য কাজ করেছে চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা।

আগেই বলা হয়েছে ১৯২৯ সালের অক্টোবরে চট্টগ্রাম শহরে যে প্রকাশ্য সম্মেলনগুলি হয়েছিল, তাদের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল সূর্য সেন পরিচালিত বিপ্লবী দল। চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবে সূর্য সেন তখন বাংলার দুটি বিপ্লবীদলের থেকেই নেতাদের প্রকাশ্য আমন্ত্রণ জানান। অন্যদিকে গোপনে তাঁদের জানানো হয়, চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা তাঁদের সঙ্গে একটি গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে জরুরী কিছু প্রস্তাব করার জন্য আগ্রহশীল।

ইংরেজ শাসকদের হাত থেকে দেশের শাসনক্ষমতা সশস্ত্র সংগ্রাম ও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ছিনিয়ে নেবার জন্য বাংলার সব বিপ্লবীদের একটি মিলিত ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা নেবার কথা চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতৃত্ব চিন্তা করেছিল।

প্রকাশ্য সম্মেলনগুলিতে ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল ইত্যাদি জেলা থেকে 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' দলের বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতারা এসেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছিলেন 'যুগান্তরের' প্রথম সারির কয়েকজন নেতা। এখানে একথা প্রাসঙ্গিক হবে যে, তৎকালে বিপ্লবী সংগঠনের শাখা পশ্চিম বাংলার চেয়ে পূর্ববঙ্গেই বেশী ছিল।

চট্টগ্রাম শহরের পূর্ব নির্ধারিত একটি বড় বাড়িতে অবিভক্ত বাংলার বিপ্লবী নেতাদের গোপন বৈঠক বসে। সেখানে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের পক্ষ থেকে প্রধান নেতা সূর্য সেন ( মাষ্টারদা ) একটি খসড়া কর্মসূচী উপস্থিত করেন। তাতে বলা হয়েছিল, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯২১-এর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে বিপ্লবীরাও যোগ দিয়েছিল, সেই আন্দোলনে কাজ করতে করতে কিছু কিছু বিপ্লবী কর্মী তখন মহাত্মা গান্ধীর নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে।

তারা চরকায় সুতাকাটা, খদ্দর তৈরী ও বিক্রয়, অস্পৃশ্যতা বর্জন ও অন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে। তবে নূতন নূতন উৎসাহী কর্মী বিপ্লবীদলে যোগ দিয়ে দলত্যাগীদের স্থান পূরণই শুধু করে না, তাদের যোগদানে বিপ্লবীদলের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে পূর্বোক্ত যে সাংগঠনিক বিভেদ বাংলার দুই বিপ্লবীদলে যুগান্তর ও অনুশীলন দলের মধ্যে ছিল, এই বিভেদ তারা কংগ্রেসের মধ্যেও নিয়ে আসে। যুগান্তর দল কংগ্রেসের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সমর্থক এবং অনুশীলন দল দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনকে সমর্থন করতে থাকে। তা সত্ত্বেও চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল ঐ উভয় দলের প্রধান নেতাদেরই জিলা সম্মেলন উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানায় এবং সারা বাংলার বিপ্লবী নেতৃত্বের কাছেই তাদের কর্মসূচী উপস্থিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

তখন মহাত্মা গান্ধী লবণ আইন ভঙ্গ করে আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা ভেবেছিলেন, সারা ভারতে যখন ঐ গণ-আন্দোলন সুরু হয়ে যাবে, তখন বিপ্লবী অভ্যুত্থানের এক সুবর্ণ সুযোগ হবে। ইংরেজ শাসকরা বিব্রত থাকবে আইন অমান্য আন্দোলন নিয়ে। তখন বাংলা দেশের সব বিপ্লবীদল যদি একটি নির্ধারিত তারিখে নিজ নিজ জেলায় সশস্ত্র অভ্যুত্থান করে, সরকারী কোষাগার দখল করে, তখন অন্ততঃ অবিভক্ত বাংলায় ইংরেজের হাত থেকে শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। এর প্রভাব তারপর ছড়িয়ে পড়বে সারা উপ-মহাদেশে। সারা দেশে সুরু হয়ে যাবে বিপ্লবী অভ্যুত্থান এবং ইংরেজ শাসকদের এখান থেকে বিতাড়িত করে সমগ্র দেশের মুক্তিপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। ঐ কর্মসূচীতে বলা হয়, ১৯২১-এর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যেমন গান্ধীজির "এক বছরে স্বরাজের" প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি, আসন্ন "আইন-অমান্য আন্দোলন"

দিয়েও দেশের স্বাধীনতা আসবে না। স্বাধীনতা আদায় করতে হবে রক্তের বদলে এবং সেইজন্য চাই সশস্ত্র অভ্যুত্থান।

ঐ প্রস্তাব নিয়ে বাংলার বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে প্রায় সারা রাত আলোচনা চলে। বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন ছাড়া, প্রায় সবাই বলেন, গান্ধীজি যে গণ-আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন, তাতেই যোগ দেওয়া ভাল হবে। তাঁকে "আর একবার সুযোগ দেওয়া হোক"—এই ছিল তাঁদের বক্তব্যের সারমর্ম।

এইভাবে বিপ্লবী নেতাদের বৈঠক শেষ হল এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে প্রস্তাব চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা এনেছিল, তা গৃহীত হল না।

তখন চট্টগ্রাম দল নিজেদের শক্তিতে যতটা সম্ভব এই জেলাতেই ঐ কর্মসূচীকে সফল করার জন্য আগে থেকে যে প্রস্তুতি চলছিল, তাকে আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত করে কাজে নেমে পড়ে। পাহাড়ে জংগলে, সাগরের বেলাভূমিতে চাঁদমারি ও মোটরচালনা শিক্ষা, বোমা তৈরী করা, নিজ নিজ বাড়ী থেকে অর্থসংগ্রহ করা, আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর লক্ষ্য রাখা ও তথ্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি কাজ খুব তৎপরতার সঙ্গে চলতে থাকে।

এই সময় অন্য একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা চট্টগ্রামের গোপন বিপ্লবীদলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। আসন্ন বিপ্লবী অভ্যুত্থানের কাজে সহায়তার জন্য মেয়েদের নেওয়া হবে কিনা এবং নিলে কি কি কাজের দায়িত্ব তাদের দেওয়া যেতে পারে এই ছিল মূল আলোচ্য বিষয়। প্রীতিলতা ও অন্য যে কয়েকটি মেয়ে তখন পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে প্রধান নেতা মাষ্টারদার তত্ত্বাবধানে কাজ করছিল, তা দলের অন্যরা কেউ জানত না। দলের তরুণ নেতারা জিলা নারী ও ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলনে বেশ কিছু মেয়েকে কর্মতৎপর দেখেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে,

সচেতন কোন অভিজ্ঞ নির্দেশ তারা ঐসব কাজে পাচ্ছে। তখন তাদের সঙ্গে মাষ্টারদার ঐ আলোচনা বৈঠক হয়েছিল। তখন পূর্ব-আলোচিত নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মেয়েদের বিপ্লবী কার্যকলাপে মেয়েদের গ্রহণের যৌক্তিকতা তিনি তাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেন।

এর পর থেকে মেয়েরাও নিজ গায়ের অলংকার অভিভাবকদের অগোচরে বিপ্লবী অর্থভাণ্ডারে দিতে থাকে। এজন্য কোন কোন মেয়ে চরম নির্যাতনও সহ্য করে, কিন্তু কিছুতেই গোপনতা উদ্‌ঘাটিত করেনি। একটি বিশিষ্ট ডাক্তারের মেয়ের বিবাহের আয়োজন চলছে। তার জন্য বেশ কয়েক ভরি সোনার অলংকার তৈরী করা হয়েছে। বিপ্লবীদলে অর্থদানের কথা মেয়েটির ভাই মাঝে মাঝে বলছে। ভাই বিপ্লবীদলের ছাত্র-সদস্য। সে তার পক্ষে যতটা সম্ভব, দেশের স্বাধীনতার জন্য ত্যাগের কথা বোনকে বুঝিয়েছে, তাকে বিপ্লবী শহীদদের জীবনী পড়তে দিয়েছে। মেয়েটি তখন স্থির করল, সে তার আসন্ন বিবাহের জন্য তৈরী সোনার অলংকার কিছু দান করবে। একদিন মার কাছে মেয়েটি আব্দার করল, বিয়ের জন্য যে নেকলেসটি তৈরী করা রয়েছে, তার খুব ইচ্ছা, তা একবার গলায় পরে দেখবে। মা সিন্দুক খুলে নেকলেসটি মেয়েকে গলায় পরতে দিলেন। তাদের শহরের বাসায় পিছনে এক পুকুর ছিল। তাতে ওদের পরিবারের সকলেই স্নান করত। পুকুরের লোকজন কম থাকলে কাছাকাছি বাসার মেয়েরা ঐ পুকুরে সাঁতারও কাটত। মেয়েটি গলায় নেকলেসটি দেওয়ার অল্পক্ষণ পরই তা গোপনে খুলে তার ভাইয়ের হাতে দিয়ে ফেলে। তারপর স্নান করতে গিয়ে পুকুরে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটে। বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে ফিরে এসে

তার মাকে কাঁদ কাঁদ গলায় বলে যে, সাঁতার কাটতে গিয়ে সোনার নেকলেসটি পুকুরে পড়ে গেছে। শুনে তার মা খুব রেগে যান এবং তাঁর তরুণী মেয়েকে যথেষ্ট প্রহার করেন তারপর মেয়েটির বাবা জেলেদের খবর দিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা জাল দিয়ে ঐ নেকলেস খোঁজ করেন। বহু খোঁজাখুঁজিতেও ঐ নেকলেস যখন পাওয়া গেল না তখন পিতামাতার সন্দেহ হল, বিপ্লবীদলের ভাইকে তা মেয়েটি দিয়ে ফেলেছে। তখন ভাই বোন দু'জনের উপরই প্রহার চলে। কিন্তু একটি কথাও তাদের কারও মুখ দিয়ে প্রকাশ হয়নি। এই রকম বহু ত্যাগ সেদিন চট্টগ্রামের অনেক বাড়ীর বধূ, মাতা ও ভগিনীরা করেছিল। তাদের কেউ কেউ ইহজগতে নেই, কেউ প্রবীণা গৃহিণী হিসাবে আজও আমাদের দেশের অনেক পরিবারে সেই সব স্মৃতিভার বহন করছেন।

৪

বাংলার অন্যান্য বিপ্লবীদলের মধ্যে তখন যে এক নিষ্ক্রিয়তার ভাব এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রতি মৌখিক আনুগত্য থাকলেও তার বাস্তব রূপায়নের প্রতি চরম অনীহা দেখা যাচ্ছিল, তা লক্ষ্য করে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল এককভাবে চট্টগ্রামেই এক অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত করেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, ঐ অভ্যুত্থানের ফলে স্বল্পকালের জন্যও চট্টগ্রামকে ইংরেজ শাসনমুক্ত করে স্বাধীন করা হয়, তার জন্য বহুগুণে শক্তিশালী বৃটিশ সরকারী বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখসমরে যদি দলের সকল সদস্যকে মরণবরণ করতে হয়, তবুও শহীদদের ঐ রক্ত-স্রোত, বীরের ঐ আত্মদান কোনদিন ব্যর্থ হবে না। তার ফলে দূর হয়ে যাবে অন্যান্য দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের কর্মবিমুখতা, ভীরুতা ও অলসতা—জেগে উঠবে নতুন এক সংগ্রামী প্রেরণা। তখন সারা

দেশে সৃষ্টি হবে বৃহত্তর সশস্ত্র সংগ্রামের দ্রুত উদ্যোগ, সফল হবে আমাদের মুক্তি-সংগ্রাম, বিতাড়িত করা সম্ভব হবে চিরতরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের আমাদের এই সোনার দেশ থেকে।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল রাত দশটায় বিপ্লবী সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনের অধিনায়কত্বে, নিখুঁত পরিকল্পনা ও পরিচালনায় যে বিপ্লবী অভিযান সুরু হয়েছিল, তার সশস্ত্র সাফল্যে কয়েক ঘণ্টার জন্য চট্টগ্রামে ইংরেজ শাসন অচল হয়ে গিয়েছিল।

প্রথমে সরকারী টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন আপিস ধ্বংস, পাহাড় তলীর সরকারী অস্ত্রাগার ও দামপাড়ার রিজার্ভ সশস্ত্র পুলিশ লাইন দখল এবং ধুম রেলওয়ে ষ্টেশনের অদূরে রেল লাইন তুলে দিয়ে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা সেদিন রাতে ইংরেজের তখনকার দিনের প্রবল দম্ভকে সম্পূর্ণ চূর্ণ করে দিয়েছিল। তাদের চরম সর্বনাশ আশঙ্কা করে চট্টগ্রামের সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ অধিবাসীরা তাদের সমস্ত নারী ও শিশুদের কর্ণফুলী নদীর মোহনায় রক্ষিত একটি বৃটিশ সওদাগরী জাহাজে স্থানান্তরিত করে সভয়ে কালযাপন করছিল।

চট্টগ্রাম শহরের দামপাড়ায় ছিল সরকারী সশস্ত্র রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর ব্যারাক। বিপ্লবীরা এই পুলিশ লাইন দখল করার পরে সেখানকার অস্ত্রাগারটি পেট্রল দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করে। তরুণ বিপ্লবী হিমাংশু সেন ঐভাবে জ্বালাতে গিয়ে সামান্য ত্রুটির জন্য নিজেই ভীষণভাবে দগ্ধ হয়ে যায়। তাকে চিকিৎসার জন্য শহরে মোটরে করে রেখে যেতে এসেছিলেন বিপ্লবী নেতা গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ আর দুই বিপ্লবী ছাত্র মাখন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত। নানা দুর্ঘটনার ফলে এই চারজন বিপ্লবী গিয়ে আর মূল দলের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন নি।

সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন এই তিন

প্রধান নেতা এবং যুব-নেতা বিপ্লবী লোকনাথ বল অন্যান্য বিপ্লবীদের নিয়ে পরবর্তী অভিযানের জন্য শহরের উত্তর পাহাড়ে রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত্রাদি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

অবশেষে ১৯৩০-এর ২২শে এপ্রিল বিকাল সাড়ে চারটায় বিপ্লবীরা সম্মুখ সমরের সুযোগ পায়। বিপ্লবীরা বৃটিশ সরকারী বাহিনীর বহুগুণে অস্ত্রচালনায় শিক্ষিত ও সংখ্যায় অনেক বেশী সেনাদলের সঙ্গে প্রায় তিন ঘণ্টা রাইফেল দিয়ে যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধ হয় জালালাবাদ পাহাড়ে। জালালাবাদ যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনী পরাজিত হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে। বিপ্লবীদের মধ্যে শহীদ হয় বার জন। সরকারী সেনাবাহিনীর মধ্যে হতাহতের সংখ্যা ৭২ জন বলে জানা গেছে। যুদ্ধে জয়লাভ করার পরে অবশিষ্ট বিপ্লবীরা শহীদদের সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে আহতদের কাঁধে নিয়ে ঐ পাহাড় ত্যাগ করেন। পরদিন সরকারী বাহিনী আরও বেশী সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ঐ পাহাড়ে বিপ্লবীদের সন্ধানে গিয়ে জালালাবাদ পাহাড়ের সবুজ ঘাস ও গুল্মের মধ্যে দেখতে পায় বিজয়ীর হাসিমুখে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত শহীদদের উপর অভিনন্দনের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে প্রভাত সমীরণ। স্বদেশের মুক্তির জন্য কচি প্রাণগুলি তারা উৎসর্গ করে অমরত্বের স্বাদ গ্রহণ করেছে। পরাধীন দেশে এই বীর বিপ্লবীদের জন্য অভিনন্দনের মালা আসেনি, তাদের মরদেহের উপর দু'টি ফুল কেউ ছড়িয়ে দেয়নি। যাদের মুক্তির ও সুখের জন্য অমূল্য তাদের প্রাণগুলি এই বীর দেশপ্রেমিকরা হেলায় দিয়ে গেল, সেই দেশবাসী শোষিত নিপীড়িত নরনারী তাদের শেষবার দেখবার সুযোগ পায়নি। লোকালয় থেকে দূরে নির্জন সেই জালালাবাদ পাহাড় তাদের বুকে নিয়ে ধন্য হয়ে রইল। সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটিয়া সেনাদল ও অন্যান্য কর্মচারী পরদিন সেখানে গিয়েছিল। সেই

হীন দেশদ্রোহীর দল শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এই আশা কেউ করেনি। কিন্তু সর্বকনিষ্ঠ চোদ্দ বছর বয়সের ছাত্র থেকে সুরু করে এই শহীদদের পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনকে পর্যন্ত তাদের প্রাণের প্রিয় সন্তানদের ঐ নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন সরকারী কর্মচারীরা শেষবারের মত দেখতে দেয়নি। তারা মৃতদেহগুলিকে এক জায়গায় জড়ো করে পেট্রল দিয়ে জ্বালিয়ে ফেলে। চট্টগ্রামে জালালাবাদ এই বীর শহীদদের স্মৃতির চিতা বুকে রেখে ধন্য হয়ে রইল।

চট্টগ্রামের এই যুদ্ধের খবর এবং শহীদদের নাম কলিকাতার পত্রিকাগুলিতে যখন প্রকাশিত হল, তখন সারা দেশ অবাক বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় ও গৌরবে বিমূঢ় হয়ে পড়ল। দৈনিক পত্রিকাগুলির বিশেষ সান্ধ্য-সংস্করণ হাজারে হাজারে বিক্রী হতে লাগল। প্রীতিলতাদের ছাত্রীনিবাসে গিয়েও এই খবর পৌছল। সে শহীদদের মধ্যে কেবল একজনকেই চিনতে পারল। সে তার প্রায় সমবয়সী এবং সম্পর্কিত ভাই হিসাবে তাকে সেও 'মেজদা' ডাকত। এই শহীদ অর্ধেন্দু দস্তিদারের নাম দেখার সঙ্গে সঙ্গে কোমলপ্রাণা প্রীতিলতার দু'চোখ ভরে নেমে এল অশ্রুধারা।

মাষ্টারদা (সূর্য সেন) যে তরুণ বিপ্লবীটির মারফত প্রীতিলতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন, সে তখন ছিল আত্মগোপনে কলিকাতার শাঁখারীটোলা লেনে। মূল দলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার পরে উপরোক্ত চার জন বিপ্লবী যখন চট্টগ্রাম থেকে রেলে কলিকাতায় আসছিলেন, তখন রেলওয়ে ষ্টেশনে সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে তাঁদের এক সংঘর্ষ হয়। তাঁদের গ্রেফতার করতে পুলিশ ব্যর্থ হয় এবং গোপনে তাঁরা কিছুদিনের মধ্যেই কলিকাতায় গিয়ে পৌছাতে পারেন। এঁদের মধ্যে বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিংহ

ঐ শাঁখারিটোলা লেনের গোপন আশ্রয়কেন্দ্রে কিছুদিন ছিলেন। যদিও এই গোপন কেন্দ্রে মেয়ে-বিপ্লবী প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, ইত্যাদি অন্যান্য সমর্থক মেয়েদের নানা কাজে যাতায়াত ছিল, তবু দলের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার জন্য ঐ কেন্দ্রের বাসার লোকজনও বিপ্লবী মেয়েদের কাছে অনন্ত সিংহের পরিচিতি কঠোরভাবে গোপন রাখা হয়েছিল।

বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিংহ ঐ কেন্দ্র ত্যাগ করার কয়েকদিন পর প্রীতিলতা সেখানে দলের কাজে যায়। কোন এক গোপন নেতা যে সেখানে দিন তিনচার ছিলেন এবং তাঁকে সেবাশুশ্রূষা করা হয়েছে, তাও প্রীতি জানতে পারে। কিন্তু চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল অভিযানের অন্যতম নেতা কেউ যে আসতে পারেন কলিকাতায়, এই ধারণা তার হয়নি।

এই আশ্রয়-কেন্দ্রটি প্রীতিলতার বিপ্লবী জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের একজন সদস্যের বিধবা পিসীমা তাঁর ছেলে মেয়েদের নিয়ে এই বাড়িতে থাকতেন। চার মেয়ে ও দু'টি ছেলে নিয়ে তিনি বিধবা হয়ে যান। তাঁদের বাড়ি ঢাকার মুন্সীগঞ্জে। সধবা অবস্থাতেই মুন্সীগঞ্জের 'যুগান্তর' দলের বিভিন্ন কর্মীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর কিছু আত্মীয় ঐ দলের সদস্য ছিল। কোন কোন সময় মুন্সীগঞ্জের বাসায় বিপ্লবীদের গোপন বৈঠকও হয়েছে। বিধবা হওয়ার পরে তিনি তাঁর প্রথম তিনটি কন্যা সন্তানকেই কিছুটা শিক্ষিত করার চেষ্টা করেন। ১৯২৯-৩০-এ তাঁর এই তিন কন্যাই কলিকাতা পৌরসভার প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজ করতেন। তিনি তখন থেকে শাঁখারিটোলায় ছোট একখানা একতলা বাড়িতে থাকতেন। এই বাড়িতে আসার পরে 'যুগান্তর' দলের কর্মীদের সঙ্গে তাঁর ছেলে মেয়ে সবারই আলাপ হয় এবং তারাও দলের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতে

থাকে। তখন একজন বিপ্লবীর পিসীমা সবারই পিসীমায় পরিণত হয়ে যান। বিভিন্ন পলাতক বিপ্লবীদের তিনি আপন সন্তানের মত পরম স্নেহে তাঁর ঐ ক্ষুদ্র গৃহে নিজেদের শত অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও আশ্রয় দিয়েছেন। যারাই বিপ্লবীদলের কাজের প্রয়োজনে তাঁর কাছে গিয়ে আশ্রয় চেয়েছে, তাদের কাউকে তিনি বিমুখ করেন নি। বহু বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তিনি ও তাঁর ছেলে-মেয়েরা পুরস্কার-ঘোষিত বিপ্লবীদের নিজেরা সঙ্গে করে এক গোপন কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে রেখে এসেছেন। তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা আশা অন্যান্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে জরুরী গোপন চিঠি নিয়ে ও অন্যান্য কাজে যখন বেশী দায়িত্ব নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বেরিয়ে যেত তখন এই পিসীমার মৌন সম্মতি থাকত।

কোন এক সময় তিনি তখনকার দিনের সবচেয়ে বিপজ্জনক চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল মামলার আসামী জেনেও তাদের আশ্রয় দিতে দ্বিধা করেন নি। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলন যখন কলিকাতায় পুরোদমে চলছিল, পুলিশের অত্যাচার, লাঠিচালনা ও গ্রেপ্তারও প্রবলভাবে সুরু হয়েছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার জন্য বৃটিশ ভারতীয় সরকার বেআইনী ঘোষণা করে। কংগ্রেসের প্রাদেশিক আপিস যখন পুলিশ তালাবদ্ধ করে, তার পুর্বেই কংগ্রেসের 'সাইক্লোষ্টাইল' যন্ত্র ও দরকারী কাগজপত্রগুলিকে বিপ্লবীদলের যারা কংগ্রেসের মধ্যে কাজ করছিল তারা সরিয়ে ফেলে। প্রতিদিনকার আন্দোলনে কি রকম অগ্রগতি হচ্ছে, কোথায় পুলিশের লাঠিচার্জ হচ্ছে, কতজন গ্রেপ্তার হচ্ছে, নির্যাতন সত্ত্বেও অসীম বীরত্ব সহকারে কোথায় স্বেচ্ছাসেবকরা লবণ-আইন ভঙ্গ করে সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরী করছে, কোথায় মহাত্মার নির্দেশিত লবণ-আইন ভঙ্গ না করে মুক্তিপাগল

জনতা রাষ্ট্রদ্রোহ-আইন পর্যন্ত ভাঙ্গতে এগিয়ে যাচ্ছে—এসব খবর সরকারী বিধিনিষেধের জন্য নিয়মিত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। তাই কংগ্রেসের একটি দৈনিক 'বুলেটিন' ঐ 'সাইক্লো'-যন্ত্রে মুদ্রিত করে বহুসংখ্যায় গোপনে বিলি করা হত, রাস্তার ধারে ধারে দেওয়ালে লাগিয়ে দেওয়া হত। ঐগুলি পড়ে জনসাধারণ আন্দোলনে আরও উদ্বুদ্ধ হয়ে, নতুন প্রেরণা নিয়ে দলে দলে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিত। কংগ্রেসের ঐ 'বুলেটিন' নিয়মিত প্রকাশ করতেই হবে, এই ছিল নেতা ও কর্মীদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু 'সাইক্লো'-যন্ত্র রাখতে হয় খুব সাবধানে এবং সেখান থেকে দৈনিক 'বুলেটিন' ছাপিয়ে জনসাধারণের মধ্যে সফলভাবে ছড়িয়ে দিতে হয়।

গোপন 'সাইক্লো-যন্ত্র বসাবার স্থানও হল পিসীমার বাসায়। এখান থেকে প্রতি রাত্রিতে কয়েকশত 'বুলেটিন' ছাপা হত এবং প্রধানতঃ বিপ্লবীদলের তরুণরা ছাপা ও বিতরণের কাজ করত।

জালালাবাদ যুদ্ধের পরে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের তৎকালীন কলিকাতা শাখার ভারপ্রাপ্ত সদস্যের কাছে মাষ্টারদার একটি ইস্তাহার গিয়ে পৌঁছায়। তার শিরোনামা ছিল—"চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সঙ্গে যুদ্ধে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়।"

তাঁর নির্দেশ ছিল, ঐ ইস্তাহার যেন বহু সংখ্যায় নকল করে কলিকাতার সর্বত্র প্রচার করা হয়।

১৯৩০-এর ২২শে এপ্রিল অপরাহ্ন চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে বৃটিশ সেনাবাহিনী চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের হাতে যখন শোচনীয় পরাজয় বরণ করে, তখন তিন জনকে মৃত মনে করে মোট তের জন বিপ্লবী শহীদের প্রতি শেষ বিদায় অভিনন্দন অন্যান্য বিপ্লবীরা দিয়েছিলেন। তখনও প্রকৃতপক্ষে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের প্রধান ত্রয়ী নেতার অন্যতম অম্বিকা চক্রবর্তী, মতি কানুনগো এবং অর্ধেন্দু

দস্তিদারের মৃত্যু হয়নি। এই তিনজন বিপ্লবী গুরুতরভাবে আহত হয়ে রক্তক্ষরণের ফলে এমনভাবে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁদের যে তখনও প্রাণ ছিল তা কেউ বুঝতে পারেনি।

পরম পরাজয়ের কালিমাময় গ্লানি নিয়ে পরদিন ভোরে আরও বেশী সংখ্যায় বৃটিশের সেনাদল, অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও গোয়েন্দাবিভাগের লোকেরা ধীরে ধীরে সশস্ত্র অবস্থায় জালালাবাদ পাহাড়ে উঠতে সুরু করেছিল, তা দেখতে পান তখন সংজ্ঞাপ্রাপ্ত অম্বিকা চক্রবর্তী। তিনজন বিপ্লবীরই কয়েকঘণ্টা পরে সংজ্ঞা ফিরে এসেছিল। তরুণ অর্ধেন্দু ও মতির আঘাত ছিল কয়েকটি মেসিনগান বুলেটের। তা থেকে প্রচুর রক্তপাতের পরে তারা অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়েছিল। সংজ্ঞালাভের পরই তারা অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে "জল", "জল" বলে আর্তনাদ করছিল। উত্থানশক্তিরহিত নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী বেশ কিছুদুর থেকে ঐ আকুতি শুনে নিজের অক্ষমতার জন্য দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে যাচ্ছিল।* তাঁর মনে হচ্ছিল, "এইসব তাজা সবুজ প্রাণ তাঁরই আহ্বানে দেশের মুক্তির জন্য এভাবে বীরের মত আত্মদান করতে এসেছিল। তাদের এই শেষ বিদায়ের ক্ষণে, মুমূর্ষুর পাশে নেই তাদের স্নেহময়ী মাতা, ভগিনী, পিতা ও ভাইবোন যে তৃষ্ণায় একফোঁটা জল দেবে। তিনি ঐ আর্তি শুনেও কিছু করতে পারছেন না, কারণ পায়ে গুলী লেগে উঠে গিয়ে তাদের পাশে গিয়ে তাঁর বসবার সাধ্য নেই।"

যখন তিনি ঐ অবস্থায় শুয়ে শুয়ে দেখলেন, সশস্ত্র সরকারী সেনাদল উঠে আসছে, তিনি আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা হিসাবে কষ্ট করে পাহাড়ের ঢালুতে নিজেকে গড়িয়ে দিলেন। আসামলতার ঝোপে গিয়ে পড়লেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি শত্রুর হাতে বন্দী হলেন না।

---

* এই সম্পূর্ণ ঘটনাটি লেখককে বিপ্লবী নেতা নিজে বলেছেন।

ঐ ঝোপের আড়াল থেকেও তাঁর কানে এসে ধ্বনিত হচ্ছিল, বিপ্লবী ঐ দু'টি তরুণ যোদ্ধার কাতর কণ্ঠস্বর। কিছুক্ষণ পরে তিনি শুনতে পেলেন দু'টি গুলীর শব্দ। তাতে স্তব্ধ হয়ে গেল মৃত্যুপথযাত্রী বিপ্লবী দু'জনের তৃষ্ণার আর্তনাদ। মতি কানুনগোর মৃত্যু হয় সঙ্গে সঙ্গে, কয়েকঘণ্টা পরে অর্ধেন্দুরও শেষ নিঃশ্বাস পড়ে।

সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন যখন উপরোক্ত ইস্তাহার রচনা করেন তখনও তিনি জানতেন না যে তাঁর প্রিয় সাথী অম্বিকা তখনও জীবিত ছিলেন। তাই তিনি ইস্তাহারে ১৩ জন জালালাবাদ শহীদের নাম দেন এবং সর্বপ্রথম নামই ছিল, অম্বিকা চক্রবর্তীর।

প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবী নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীকে আহত অবস্থায় একজন স্থানীয় মুসলিম কৃষক নিজের কাঁধে করে নিয়ে যায়। আমজাদ আলী নামে একজন কৃষক তাঁকে ঐ যুদ্ধে আহত জেনেও প্রথম আশ্রয় দেয়। পরে তিনি চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার ফতেয়াবাদ গ্রামের এক মহীয়সী মুসলিম মহিলার আশ্রয়ে ছিলেন। এই সম্পর্কে অম্বিকা চক্রবর্তী নিজেই বলেছেন:

"...একটি মুসলিম মায়ের কথা এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে। ফতেয়াবাদের বড় দীঘির পাড়ে বৃদ্ধা বিধবা ফয়েজুন্নেসার বাড়িতে আমি দুইদিন দুই রাত্রি ছিলাম। তখন তাঁর ১৭।১৮ বছরের ছেলে ফজল আহমদ জালালাবাদ পাহাড়ে একটি ওয়েব্‌লি রিভলভার কুড়িয়ে পায় এবং আমাকে তা এনে দেয়। তার জন্য কিছু দাম বা পুরস্কার আমি ঐ ফয়েজুন্নেসা বিবিকে দিতে গেলে, তিনি বলেন, এইটি দিয়ে একটা সাহেব (ইংরেজ) মারলে আমি বেশী খুশি হব।"

[ লেখকের "স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম"— ১৫৮ পৃঃ ]

যাই হোক, ঐ ইস্তাহারটি বহুসংখ্যা ছাপানোর ব্যবস্থা হয় শাঁখারীটোলা লেনের গোপন কেন্দ্র পিসীমার বাসায়। প্রায় তিন রাত্রি ধরে হাতে মেশিনের হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রীতিলতা ও অন্য দুই তিনজন বিপ্লবী এক হাজারের বেশী ইস্তাহার তৈরী করে। তার কিছু অংশ প্রীতিলতাদের বেথুন কলেজ হোষ্টেল, কলেজ এবং অন্যান্য মহিলা কলেজ ও হোষ্টেলে গোপনে প্রচারের দায়িত্ব সে নিজেই নিয়েছিল। বিপ্লবী ছেলেরা ঐ ইস্তাহার কলিকাতার অনেক প্রধান প্রধান রাস্তার পাশে দেওয়াল ও অন্যান্য জায়গায় রাত্রিতে গোপনে আঠা দিয়ে এঁটে দিয়েছিল। এই সম্পর্কে দৈনিক সংবাদপত্রে যে বিবরণ ছিল, তাতে কয়েকটি মাত্র নাম ছিল, বিবরণও সঠিক ছিল না। ইস্তাহারটি ঐভাবে প্রকাশের ফলে, তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী কলিকাতায় খুব সাড়া পড়ে যায়। অবশ্য পরে পুলিশ দেখতে পেয়ে, অনেক জায়গা থেকে ইস্তাহার ছিঁড়ে তুলে ফেলে দেয়।

৫

চট্টগ্রামের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐ বিবরণ পড়বার পর থেকেই প্রীতিলতা বিপ্লবী কাজে আরও প্রত্যক্ষভাবে যোগদানের জন্য চঞ্চল হয়ে পড়ে। একদিন গোপনকেন্দ্রে এসে সে অশ্রু-সজল নেত্রে পিসীমাকে শহীদদের কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে বলল, সে ঐ ১৩ জন শহীদদের মধ্যে কেবল তার সম্পর্কিত বড় ভাই অর্ধেন্দু দস্তিদারকে চিনত ব্যক্তিগত ভাবে। প্রধান নেতা অম্বিকা চক্রবর্তীকে সে দূর থেকে দেখেছে। অন্য যেসব ঐভাবে আত্মদান করল, তাদের নামও সে কোনদিন শোনেনি। তবু তাদের মত সেও মরতে চায়, অত্যাচারের

প্রতিশোধ নেবার জন্য সেও লেখাপড়া ছেড়ে কাজে নেমে পড়তে উৎসুক। পিসীমা তাকে বলেন, এসব কাজে অধৈর্য হলে চলবে না। তিনি তাকে আসন্ন বি-এ পরীক্ষার জন্য লেখাপড়া করতে বলেন এবং নেতাদের কাছে তার বক্তব্য জানাতে পরামর্শ দেন।

কয়েকদিন পর্যন্ত সে তার ছাত্রীনিবাসে ফিরে যায় না। সে কেবলই ভাবে, ছেলেরা এমন বীরের মত প্রাণ দিচ্ছে, মেয়েদের কেন এই সুযোগ দেওয়া হবে না। অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলে, নারীপুরুষের সমান অধিকার ও সুযোগের কথা অনেকে মুখে বললেও, কাজের বেলায় তাদের কেন বিশ্বাস করা হবে না? বিপ্লবীদল কি এই মনোভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে পারবে না? সে দাবী করতে থাকে তাকে চট্টগ্রাম গিয়ে মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হোক। তিনি মহান বিপ্লবী নেতা। তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যোগদানের অনুমতি সে আদায় করে নিতে পারবে। এসব কথা যখন সে বলত, তখন তার চোখেমুখে আত্মোৎসর্গের এক অদ্ভুত জ্যোতি ফুটে উঠত, পরম প্রতীতি প্রকাশিত হতো যে, সে দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ অঞ্জলিভরে তুলে দিতে পারবে।

কলিকাতার সর্বপ্রথম ও প্রধান মহিলা কলেজ বেথুনে প্রীতিলতা ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্রী। দর্শনশাস্ত্রে সে অনার্স নিয়েছিল। ক্লাসের পরীক্ষায় বাংলা ও দর্শনে সে সব সময় প্রথম হতো। সেজন্য সে অধ্যাপিকাদের প্রিয়পাত্রী ছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধের খবর পাওয়ার পর থেকে লেখাপড়ায় তার শৈথিল্য দেখা দেয়। সে তার ছাত্রীনিবাসের মধ্যে বিপ্লবের মন্ত্র প্রচারে বেশী সময় দিতে থাকে। সরকারী বাজেয়াপ্ত বই সে বিপ্লবীদের কাছ থেকে যোগাড় করে ছাত্রীদের নিয়মিত পড়াতে

থাকে। তার তৈরি মেয়েদের চক্রে তখন মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাদের কাছ থেকে সে বিপ্লবীদলের জন্য চাঁদা ও সোনার কিছু কিছু অলংকার তুলে দলের অর্থভাণ্ডারে দিতে থাকে।

এই সময় বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের ময়মনসিংহ, মুন্‌শীগঞ্জ ও কলিকাতার কোন কোন উপদলের মেয়ে-বিপ্লবীদের সঙ্গে প্রীতিলতার পরিচয় হয়। তার মধ্যে কমলা চাটার্জি, রেণুকা রায়, তনিমা সেন ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত কল্পনা দত্ত, সরোজিনী পাল, নলিনী পাল ইত্যাদি প্রীতিলতার সঙ্গে একই সঙ্গে বেথুন কলেজের বারাণসীদাস স্ট্রিটের ছাত্রী-নিবাসে থাকত।

চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের অভূতপূর্ব সফল অভিযানে বাংলার অন্যান্য জেলার বিপ্লবীদলের তরুণ সদস্যদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষে যোগ দেবার জন্য বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সেসব দলের প্রধান প্রধান নেতাদের অনেকেই তখন বিনাবিচারে আটক হয়ে বাংলার বিভিন্ন আটকখানায় ও কারাগারে বন্দী ছিলেন। ঐ সব দলের তরুণ সদস্যরা যখন জানতে পারে যে, চট্টগ্রাম দলের দুই প্রধান নেতা গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ কলিকাতায় আছেন, তখন তারা ঐ দুই নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করার এবং তাঁদের নেতৃত্বে কলিকাতায় একটি বিপ্লবী অভিযানের জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে। তারা নিজ নিজ উপদলের নেতাদের নিষ্ক্রিয়তায় বিক্ষুব্ধ হয়ে, বিভিন্ন দলের তরুণ বিপ্লবীদের নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠনে মিলিত হয়।

তখন ঐ সব দলের মেয়েদের সঙ্গে চট্টগ্রামের প্রীতিলতা ও অন্যান্য মেয়েদেরও এক যুক্ত সংগঠন হয়। কলিকাতায় কোন কিছু যুক্ত উদ্যোগে করা হল, সেই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে এই সংগঠন থেকে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

চট্টগ্রামের আত্মগোপনরত নেতা ও কলিকাতার অন্যান্য দলের

কর্মোৎসাহী বিপ্লবীদের যুক্ত বৈঠকে অল্পদিনের মধ্যেই একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। কলিকাতায় যেসব বৃটিশ ও বিদেশী হোটেল ছিল, স্থির হয়েছিল নির্ধারিত তারিখে সন্ধ্যার পরে একই সময়ে বিপ্লবীরা বোমা, রিভলবার ও পিস্তল নিয়ে ঐগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ইংরেজ শাসনামলে ভারতের বড় বড় শহরে সরকারী চাকুরী ও ব্যবসায় উপলক্ষে যেসব ইংরেজ ও বিদেশী বসবাস করত, তাদের নিজস্ব ক্লাব ছিল। সেখানে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার ছিল না। কোনটির ফটকে ফটকে লেখা থাকত, "ভারতীয় ও কুকুরের প্রবেশ নিষেধ।" বিপ্লবীরা মনে করত ঐসব ক্লাবে বা অন্যান্য স্থানে সমবেত ইংরেজ নরনারীদের হত্যা করে দেড় শত বৎসরের শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়নের তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করবে এবং ঐরকম অভিযান যত বেশী হবে, ইংরেজ শাসকরা ততই আতংকগ্রস্ত হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা এই দেশ ত্যাগ করে চলে যাবে—দেশ হবে পরশাসনের শৃঙ্খলমুক্ত। কলিকাতার পরিকল্পনার মধ্যেও বিপ্লবীদের ঐ বিশ্বাস ছিল।

দেশের জন্য বুকের রক্ত হেলায় বিলিয়ে দেবার জন্য সেদিন প্রীতিলতা ও অন্যান্য যেসব মেয়ে-বিপ্লবী চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তাদের যখন এই সিদ্ধান্ত জানানো হল, তখন তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল অপূর্ব বৈপ্লবিক আত্মদানের জন্য গভীর নিষ্ঠার এক ভাস্কর দীপ্তি। অধীর আগ্রহে প্রীতিলতা তখন ঐ পরম শুভক্ষণটির জন্য অপেক্ষা করছিল। তার চোখে তখন ঘুম নেই। কয়েক মাস পরই 'দর্শনে' অনার্স নিয়ে তার বি-এ পরীক্ষা। কিন্তু লেখাপড়া, পরীক্ষা সবই তার কাছে হয়ে উঠেছিল অর্থহীন। পরাধীন মাতৃভূমির বন্ধনশৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য কখন সে নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দিতে পারবে, কখন তার সেই কামনা পরিতৃপ্ত হবে, প্রীতিলতা তখন সেই কথাই তার

কলিকাতাস্থ ছাত্রীনিবাসে খোলা ছাদে বসে বসে অনেক রাত পর্যন্ত ভাবত। সেখানে মাঝে মাঝে বেজে উঠত করুণ সুরে প্রীতির হাতের বাঁশী। গভীর রাতে মেয়েদের ছাত্রীনিবাস থেকে ঐ বাঁশীর সুর কোন বিনিদ্র প্রতিবেশীকে বিস্মিত করত। এজন্য কোন সময় মহিলা-সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌টের তিরস্কারও প্রীতিকে সহ্য করতে হয়েছে।

কিন্তু 'তুচ্ছ আমার প্রাণ দেশের জন্য দেব' এই যার পণ, তার কাছে সেসব ছিল অতি স্বাভাবিক প্রাপ্য। মাঝে মাঝে সে খবর নিত, অভিযানের এত দেরী হচ্ছে কেন।

বাংলার সবগুলি বিপ্লবীদল প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবক ও ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হত। তাই আদর্শ লক্ষ্যের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত নেতৃত্ব, এবং দলগত প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসীদের মধ্যেও যুগান্তর, অনুশীলন, শ্রীসংঘ, বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স ইত্যাদি দল ও উপদলের সৃষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন বিপ্লবীদল তাদের সংগৃহীত অস্ত্র, অর্থ ও সদস্য-সংখ্যা গোপন রাখত। সুযোগ পেলে এক দলের অস্ত্র, নিষিদ্ধ বই, সাইকেল ও অন্যান্য জিনিসপত্র ঐ দলের সদস্যকে নানাভাবে বুঝিয়ে নিজ দলে টেনে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছ থেকে নিজ দলের জন্য নিয়ে আসত।

১৯৩০-এর এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের বিস্ময়কর সাফল্যের পরে, অবিভক্ত বাংলার অন্যান্য জেলার বিপ্লবীদের মধ্যে এক নতুন উন্মাদনা ও কর্মচাঞ্চল্য জেগেছিল, তা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু কলিকাতার বিদেশী হোটেল আক্রমণ পরিকল্পনা কার্যকরী করার সময় চট্টগ্রামের কলিকাতায় আত্মগোপনরত চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতারা যদি নেতৃত্ব দেন, তখন কলিকাতায় সংগঠিত ঐ বিপ্লবী অভিযানের কৃতিত্বও হবে চট্টগ্রাম-বিপ্লবীদলের—

কোন কোন বিপ্লবী নেতার কাছে তা স্বীকার করা কঠিন বলে মনে হয়।

সেজন্য খুলনার বিপ্লবীদলের কলিকাতায় অবস্থানরত নেতা ও সদস্যারা নিজেরা এককভাবেই কলিকাতায় একটি বৈপ্লবিক কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

তখন কলিকাতার ইংরেজ পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট বাঙ্গালী বিপ্লবীদের উপর চরম অত্যাচারের জন্য অত্যন্ত কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল। সেজন্য যুগান্তর বিপ্লবীদের বিভিন্ন শাখা থেকে এই টেগার্টকে হত্যার বহু পরিকল্পনা হয়। একবার চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের জুলুদা ( নগেন সেন, কোয়েপাড়া, চট্টগ্রাম ) ও অনন্ত সিং এবং কলিকাতা যুগান্তর দলের তুইজন বিপ্লবী দেবেন দে * ও গোপীনাথ সাহা—এই চারজন মিলে টেগার্ট-হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা নিজেদের সাংগঠনিক কিছু ত্রুটির জন্য ব্যর্থ হয়। পরে ১৯২৪ সালের ১২ জানুয়ারী বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা আবার একাই টেগার্টকে হত্যার চেষ্টা করে। গোপীনাথ অনেক দিন পর্যন্ত গোপনে টেগার্টের গতিবিবি লক্ষ্য করেছে। তার সাথীদের কাছে সে বলত, যেমন করেই হোক সে টেগার্টকে হত্যাকরবে। কিন্তু তার এতদিনের সেই কামনা সেদিন পূর্ণ হয়নি। টেগার্ট ছিল ইংলণ্ডের কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা "স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের" শিক্ষিত অত্যন্ত ধূর্ত পুলিশ কর্মচারী। তার সম্পর্কে অনেক প্রচলিত কাহিনীর অন্যতম হল, সে কোন রাস্তা দিয়ে কলিকাতায় চলাফেরা

---

* ১৯২৩-এর ডিসেম্বরে বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর 'টাইগার-পাশে' যে রেলওয়ে ডাকাতিতে বিপ্লবীরা ১৭ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছিল, তাতে চট্টগ্রামের বিপ্লবী উপেন ভট্টাচার্য (কয়েক বৎসর পূর্বে স্বগ্রাম বেতাগী, চট্টগ্রাম-এ পরলোকগত) অনন্ত সিংহ ও রাজেন দাসের সঙ্গে এবং দেবেন দে (খোকাদা) ছিলেন।

করবে তা বিশেষভাবে গোপন রাখত এবং অনেকটা তার মত চেহারার অন্য একটি ইংরেজকে তার মত একই পোষাকে সজ্জিত করে, একই রঙ ও নম্বরের অন্য একটি মোটরে করে তার নিজের গাড়ির আগে চলতে দিত। চার্লস টেগার্টের বদলে সেদিন গোপীনাথের অব্যর্থ গুলীতে নিহত হয়েছিল মিঃ ডে নামে অন্য একটি ইংরেজ। পথেই গোপীনাথ ধৃত হয় এবং দেশের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সকল আবেদনকে অগ্রাহ্য করে ইংরেজ সরকার তাকে ফাঁসি দেয়।

তারপর অন্যান্য বিপ্লবীদলের অন্যান্য প্রচেষ্টাও সফল হয় না। তাই টেগার্টকে হত্যা করা তখন বাংলার বিপ্লবীদলের কাছে জরুরী ও দলের মর্যাদা বৃদ্ধি সহায়ক বলে মনে হত।

এইজন্য খুলনার বিপ্লবীরা গোপনে টেগার্ট হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের সঙ্গে অন্যান্য বিপ্লবীদলের মৃত্যুপাগল দেশপ্রেমিকেরা কলিকাতার বিদেশী হোটেল আক্রমণের জন্য যে মিলিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, খুলনার দলও তাতে সরিক ছিল। তাই ঐ পরিকল্পনা কার্যকরী করার পূর্বেই তারা টেগার্ট-হত্যার কাজ শেষ করা ঠিক করেছিল। এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, খুলনার ছাত্র-বিপ্লবী অনুজা সেনকে। ১৯৩০-এর আগষ্ট মাসে কলিকাতা ডালহৌসি স্কোয়ারের পাশ দিয়ে যখন টেগার্টের মোটর কার যাচ্ছিল, তখন অনুজা সেন বিপ্লবীদের তৈরী এক নতুন ধরণের হাত-বোমা তার উপর নিক্ষেপ করে। কিন্তু এই হাত-বোমার সলিতা কিছু ত্রুটিপুর্ণ থাকায়, বোমার বিস্ফোরণে অনুজা সেনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। বোমার ছোট কিছু টুকরা গিয়ে মোটরের কাঁচ সামান্য ভাঙ্গে এবং অক্ষতদেহে টেগার্ট রক্ষা পেয়ে যায়।

এই ঘটনার ফলে, কলিকাতার যে বিপ্লবী কাজে মেয়েদেরও অংশ গ্রহণের কথা ছিল, তা আর সম্ভব হয় না।

অনুজা সেন নিজের মৃত্যুহীন প্রাণের বিনিময়ে যে ইংরেজ কর্মচারীটির প্রাণ নিতে পারলেন না, সে এই উপলক্ষে নতুন হিংস্রতা ও নগ্ন বর্বরতা নিয়ে কলিকাতার বিপ্লবীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টেগার্ট কলিকাতার বুকে এমন এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করল যে, বিপ্লবীদলের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক যেসব ছাত্র অথবা তরুণদের ছিল, তাদের নির্বিচারে গেপ্তার করা ও অকথ্য নির্যাতন চলতে লাগল। মধ্য-কলিকাতার এক তরুণ সমাজসেবী হিসাবে তখন বিশেষ জনপ্রিয় একজন ডাক্তার বিপ্লবীর বাড়ীতে টেগার্টের উপর নিক্ষিপ্ত বোমার কারখানা গোয়েন্দা পুলিশরা আবিষ্কার করতে পারল। [এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৩০-এর ডিসেম্বরে চট্টগ্রাম বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তীকে যখন তৎকালীন অন্যতম প্রাদেশিক পুলিশপ্রধান মিঃ ক্রেগকে হত্যা করতে পাঠানো হয়েছিল, তাঁদের কাছেও এই কারখানায় তৈরী ঐ নূতন ধরণের চারটি হাতবোমা ছিল।] এই ব্যাপারে ধৃত ব্যক্তিদের নিয়ে সরকার বিখ্যাত 'ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলা'' সুরু করল মাসখানেকের মধ্যেই।

এই সন্ত্রাসের রাজত্বের মধ্যে কলিকাতার মেয়ে-বিপ্লবী সদস্য ও সমর্থকরা অসীম সাহসের সঙ্গে আত্মগোপনরত বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল যোগাড় করা, অস্ত্রশস্ত্র নিরাপদে স্থানান্তরিত করা ও যোগাযোগ রক্ষার কাজ সফলভাবে করেছিল। প্রীতিলতা ও তার সাথী মেয়েরা তখন অর্থ ও নিজেদের গায়ের অলংকার খুলে বিপ্লবী কাজের জন্য দান করেছিল।

ঐসময় আত্মগোপনরত একজন চট্টগ্রাম বিপ্লবীর সঙ্গে অন্য একজন আত্মগোপনকারী বিপ্লবীর সঙ্গে জরুরী সাক্ষাতের দরকার হয়। কলিকাতায় পুলিশ তৎপরতার তীব্রতা বিবেচনায়

স্থির হয়, দক্ষিণ কলিকাতায় সন্ধ্যায় অতি জনসমাকীর্ণ একটি "কার্নিভেলে" ঐ সাক্ষাতের জন্য উভয়ে মিলিত হবে। মেয়ে-বিপ্লবী সমর্থকরা তাদের সেখানে আনা নেওয়ার কাজ করবে। কলিকাতা গোপন পুলিশের এক ইনস্‌পেক্‌টরের দু'টি মেয়ের একটি পড়ত আই-এ, অন্যটি ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থিনী। এই দু'টি মেয়েই তাদের এক বিপ্লবী তরুণ আত্মীয়ের মারফত বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তারা তাদের পিতার সঙ্গে গল্পের ছলে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিশী তৎপরতার কিছু কিছু গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে বিপ্লবীদের দিত। চট্টগ্রামের বিপ্লবী তরুণটিকে ঐ "কার্নিভেলে" নেওয়ার দায়িত্ব এই দুই বোন নিয়েছিল। "কার্ণিভেলের" বিচিত্র আলোকসজ্জা ও বহু নরনারীর ভিড়ের মধ্যে বিপ্লবী তরুণটিকে নিয়ে স্বাভাবিক দর্শনার্থীর মত তারা ঘুরতে থাকবে। অন্য বিপ্লবীটিকে নিয়ে আর একটি মেয়ে আসবে। সে ছিল তনকার দিনের সুপ্রসিদ্ধ একজন বাংলা ঔপন্যাসিক ও কলিকাতা হাইকোর্টের বড় এডভোকেটের মেয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজের বি-এ ক্লাশের ছাত্রী। এই তিন জন মেয়েই প্রীতিলতাদের মেয়ে বিপ্লবী চক্রের সদস্যা হিসাবে পরিচিতা। তারা সেখানে ঠিক সময়মত পৌঁছায় এবং ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে ঘোরাফিরা করতে থাকে। চট্টগ্রামের একজন দক্ষ গোয়েন্দা পুলিশ ইনস্‌পেক্‌টর চট্টগ্রামের যেসব আত্মগোপনরত বিপ্লবী কলিকাতায় ছিল, তাদের খোঁজে তখন কলিকাতায় এসেছিল। সেই লোকটি সম্ভবতঃ ঐ কার্নিভেল দেখার জন্যই ঐ সন্ধ্যায় সেখানে গিয়েছিল। কলিকাতার গোয়েন্দা বিভাগের মেয়েদের যে বড়, সে হঠাৎ দূরে থেকে তাকে চিনতে পারে। কারণ তার বাবার সঙ্গে আলাপ করতে ঐ লোকটি কয়েকদিন আগেই তাদের বাসায় গিয়েছিল এবং কি কারণে তাকে দায়িত্ব

দিয়ে কলিকাতায় পাঠানো হয়েছে, তা বলতে মেয়েটি শুনেছিল। মেয়েটি হঠাৎ চট্টগ্রামের আত্মগোপনরত বিপ্লবী তরুণটির হাতখানা অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে নিজ হাতের মধ্যে নিয়ে তাকে ঠিক বিপরীত দিকে টেনে নিয়ে জোরে জোরে চলতে থাকে। তরুণটি খুবই বিব্রত হয়ে তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকে, কারণ কোন তরুণী মেয়ের পক্ষে তখন কোন বিপ্লবী ছেলেকে ঐভাবে হাত ধরে টেনে নেওয়া স্বাভাবিক ছিল না। তার ছোট-বোনটিও তাদের পিছন পিছন যেতে থাকে। কিছুদুর যেতেই রাস্তার কাছেই ছিল "কানিভেলের" এক বাহির-পথ। মেয়েটি তাড়াতাড়ি একটি অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে তরুণটি ও তার ছোটবোনকে নিয়ে উঠে পড়ে, চালককে আদেশ দেয় তাদের বাসার ঠিকানায় যেতে। ট্যাক্সি ছেড়ে দেবার পর মেয়েটি সব ঘটনা খুলে বলে এবং আর একটু দেরী করলেই কিভাবে ঐ চট্টগ্রামের গোয়েন্দা ইনস্পেক্টরের সামনে তারা পড়ে যেত সেই কথাই বলে। তরুণটির নিরাপত্তার জন্য মেয়েটি তাকে নিয়ে যায় সোজা তাদের বাসায়। সে জানত তার বাবাও তখন কর্তব্যপালনের জন্য বাড়িতে অনুপস্থিত থাকবে। তাদের পাড়ায় যে গোয়েন্দা ও অন্যান্য পুলিশ কর্মচারীদের কোয়ার্টার, তাতে কোন বিপ্লবীর যে আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব তা সন্দেহ করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। মেয়েটি তাদের একটি সাধারণতঃ অব্যবহৃত ছোটঘরে তরুণটির ঐ রাত্রিতে ও পরদিন (কারণ তখন আত্মগোপনরত কোন বিপ্লবী দিনে কোথাও চলাফেরা করত না) থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে। প্রীতিলতা ও অন্যান্য বিপ্লবীদলের মেয়েরা এইভাবেই তখন মেয়েদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল।

"চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা" তখন চট্টগ্রামের বিশেষ

আদালতে সুরু হয়ে গেছে। প্রতিদিনকার দৈনিক সংবাদপত্রে বড় বড় শিরোনামায় ঐ মামলায় খবর পরিবেশিত হচ্ছে। ঐ সব খবর রোজ পড়তে পড়তে চট্টগ্রামে গিয়ে গোপনে বিপ্লবীদলের নেতার সঙ্গে দেখা করে প্রত্যক্ষ কাজে যোগ দেবার জন্য প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত অস্থির হয়ে উঠে। তু'জনেই ভাল ছাত্রী। কল্পনা চট্টগ্রামের ডাঃ খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকে পনর টাকা বৃত্তি পেয়ে তখন বেথুন কলেজের আই-এস-সি ক্লাসে পড়ছে এবং তু'জনই ১৯৩১-এ শেষ পরীক্ষার (বি-এ ও আই-এস-সি) জন্য তৈরী হচ্ছে। কিন্তু পড়ায় তাদের মন নেই, প্রাণদানের অভিযানে যাবার জন্য তারা উদ্‌গ্রীব। চট্টগ্রামে গোপনে অবস্থানরত প্রধান নেতা সূর্য সেনের জন্য তখন পুলিশ গেজেটে তাঁকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরার জন্য পুরস্কারের পরিমাণ বাড়িয়ে ৫০০০৲ টাকা থেকে ৭৫০০৲ করা হয়েছে। চট্টগ্রামের যে বিপ্লবীচক্র কলিকাতায় ছিল তিনি তাদের সঙ্গে তখনও যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। তাঁর কাছে প্রীতিলতাদের আবেদন জানানো হলে, তিনি বলেন, এখনও সময় আসেনি, সময় হলেই তিনি খবর দেবেন।

ইতিমধ্যে গোপন এক দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার ঐ কলিকাতা চক্রের উপর চট্টগ্রাম থেকে দেওয়া হয়। জালালাবাদ সংঘর্ষের পরে মাষ্টারদা সূর্য সেনের পরিচালনায় চট্টগ্রামে আরও বিপ্লবী সংঘর্ষের প্রয়োজনে গোপনে বোমা তৈরী চলছিল। তার জন্য অত্যন্ত জরুরী এক অংশ "গান-কটন"। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা এই জিনিসটি তৈরী করতে বার বার ব্যর্থ হচ্ছিল। তখন কলিকাতায় খবর দেওয়া হয় এবং সেখানকার অভিজ্ঞ সদস্যের উদ্যোগে "গান-কটন" বেশ কিছু পরিমাণ তৈরী করে পাঠাবার নির্দেশ মাষ্টারদা পাঠিয়েছিলেন।

"গান-কটন" তৈরী করার জন্য তৎকালীন কলিকাতার সর্বপ্রধান ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা থেকে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করার জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব প্রীতিলতাদেরও দেওয়া হয়। গরীব কেরানীর মেয়ে প্রীতিলতা। সে মাসে কুড়ি টাকা বৃত্তি পায় আর বাবার কাছ থেকে মনিঅর্ডার আসে কোন মাসে দশ, কখনও পনের টাকা। তার হাতে দু'খানা করে ব্রোঞ্জের উপর পাতলা সোনার পাত বাঁধানো চুড়ি, গলায় সরু একখানা সোনার চেন-হার। অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রীতিলতা প্রথমে হাতের দুখানা চুড়ি ও গলার হারখানা দিয়ে দেয়। তারপর সে অন্যান্য মেয়েদের কাছ থেকে সহজেই অলংকার সংগ্রহ করতে পারে।

"গান-কটন" তৈরী করার কাজে সাধারণতঃ বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী বিপ্লবীদেরই নেওয়া হত। মেয়েদের মধ্যে আই-এস-সি ছাত্রী কল্পনা দত্তকে ঐ কাজে নেওয়া হয়। প্রীতিলতা বিজ্ঞানের ছাত্রী না হলেও ঐ প্রত্যক্ষ কাজে যোগ দেবার জন্য দাবী করতে থাকে। সে বলে, তাকে শিখিয়ে দিলে সে ঠিক পারবে। তবু দলের পূর্ব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বি-এস-সি ক্লাসের ছাত্র তারকেশ্বর দস্তিদার * ১৯৩০-এ চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের কয়েকদিন পূর্বে আরেকজন বিপ্লবী অর্ধেন্দু দস্তিদারের সঙ্গে বোমা তৈরী করতে গিয়ে এক বিস্ফরণে গুরুতর ভাবে দগ্ধ হয়। তাদের প্রাণসংশয় হয়েছিল। তাই প্রীতিলতাকে ঐ

---

* ১৯৩৪-এর ১২ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম জেলে সূর্য সেনের সঙ্গে তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসী হয়। এর কয়েকমাস পূর্বে আত্মগোপনরত কল্পনা দত্ত ও তারকেশ্বর দস্তিদারের সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনীর সঙ্গে অনেকক্ষণ গুলী বিনিময়ের পরে তাদের দুইজন গ্রেপ্তার হয়ে যায়। বিচারে তারকেশ্বরের ফাঁসী ও কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়।

কাজে নেওয়ার ব্যাপারে দলের আপত্তি ছিল। কিন্তু প্রীতি এমনভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল যে, শেষ পর্যন্ত তার দাবী মেনে নিতে হয়। অল্প আয়াসেই প্রীতিলতা ঐ রাসায়নিক প্রক্রিয়া আয়ত্ত করতে পারে। কলিকাতার তৈরী ঐ "গান-কটন" চট্টগ্রামে পাঠানো হলে, তার কার্যকারিতা লক্ষ্য করে মাষ্টারদা খুব প্রশংসা করে কলিকাতায় খবর দিয়েছিলেন।

৬

তৎকালীন ইংরেজ পুলিশ ডি-আই জি মিঃ ক্রেগ সরকারী কাজে ১৯৩০-এর ডিসেম্বরে চট্টগ্রাম এসেছিল। চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের পক্ষ থেকে তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত হয়। সূর্য সেন এই কাজের দায়িত্ব দুইজন সাহসী বিপ্লবী তরুণের উপর দিয়েছিলেন। মিঃ ক্রেগ যখন চট্টগ্রাম থেকে কলিকাতা ফিরবার পথে চাঁদপুরে ষ্টেশনে যাবে, তখন তাকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বিপ্লবী তরুণরা রিভলভার ও বোমা নিয়ে গোপনে চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুরে যায়।

জালালাবাদ সংঘর্ষের পরে চট্টগ্রাম-বিপ্লবীদের যে অংশ আত্ম-গোপনে ছিল, তারা কখনও নিষ্ক্রিয় থাকতে রাজি হয়নি। যখনই সম্ভব তখনই ইংরেজ রাজকর্মচারী হত্যা করতে হবে, তাদের মধ্যে এমন ত্রাস সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তারা এই দেশের শাসনভার ছেড়ে চলে যায় এবং এইভাবেই দেশে আসবে ঈপ্সিত স্বাধীনতা। কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখার জন্য এবার লক্ষ্য হল ক্রেগ।

তরুণ বিপ্লবী কালিপদ চক্রবর্তী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের দিন থেকে জালালাবাদ সংঘর্ষ পর্যন্ত সব অভিযানে অংশ গ্রহণ করে তখন আত্মগোপন করছিল, অন্য বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ( দু'জনেরই বাড়ী চট্টগ্রাম বোয়ালখালী থানার সারোয়াতলী গ্রামে ) ১৮ই

এপ্রিল, ১৯৩০ ইং তারিখের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আয়োজনে বোমা তৈরী করতে গিয়ে গুরুতরভাবে দগ্ধ হয়েছিল। একজন দেশপ্রেমিক চিকিৎসক অনেক কষ্টে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে বিভিন্ন গোপন আস্তানায় রেখে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে নিরাময় করে তোলেন। অভ্যুত্থানের দিন পর্যন্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাস শয্যাশায়ী থাকায়, এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী তরুণকে তাতে যোগদানের অনুমতি দেওয়া সম্ভব হয়নি। পুলিশ ঐ বিস্ফোরণের সংবাদ পেয়ে তার বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করে শহরে ও গ্রামের বহুস্থানে খানাতল্লাসী চালায়, কিন্তু বিপ্লবীদলের নিখুঁত সাংগঠনিক শক্তির জন্য রামকৃষ্ণের কোন সন্ধান পায় না। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস সুস্থ হওয়ার পরে আত্মগোপনরত বিপ্লবীদের সঙ্গে তার সক্রিয় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রেগ হত্যার কাজে দলের নেতা এই বিশিষ্ট ও পরীক্ষিত বিপ্লবীকেও নির্বাচিত করেন। চাঁদপুর রেলষ্টেশন সেদিন ছিল ঘন কুয়াসায় ঢাকা। যে প্রথমশ্রেণীর রেল কামরায় ক্রেগ বসেছিল, তার সঠিক বিবরণ বিপ্লবী দল আগেই সংগ্রহ করেছিল। গাড়ি চাঁদপুর ষ্টেশনে থামার সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লবী তরুণদ্বয় তড়িৎবেগে ঐ কামরায় প্রবেশ করে। ক্রেগ তার দেশীয় অন্যান্য ইংরেজদের মত সদাজাগ্রত ও ভীত অবস্থায় কামরার শেষ দিকে কোণায় বসেছিল। ঐভাবে দু'জন তরুণকে গাড়ির দরজা খুলতে দেখেই সে দ্রুত রেলের পায়খানার মধ্যে পালিয়ে গিয়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। ক্রেগের সঙ্গে তার সাহায্যের জন্য এক বাঙ্গালী পুলিশ ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জীও ছিল। দীর্ঘকায় এই লোকটি শীতে ওভারকোট মুড়ি দিয়ে বসেছিল। বিপ্লবীরা ভোরের অস্পষ্ট আলোয় তাকেই ক্রেগ মনে করে এবং দু'জনেরই অগ্নিনালিকা তার বুক লক্ষ্য করে একসঙ্গে গর্জন করে ওঠে। তারিণী মুখার্জী সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করে।

এই তরুণ বিপ্লবীরা যখন শুনতে পায় যে, তারিণী "বাপরে গেলাম" আর্তনাদ করে রক্তাক্ত অবস্থায় গাড়ির মধ্যে এলিয়ে পড়ল, তখন তারা বুঝতে পারে, ইংরেজ ক্রেগ নিহত হয়নি। অবিলম্বে তারা গাড়ী থেকে নেমে রিভলভারের কয়েকটি গুলী আকাশের দিকে ছোঁড়ে। চাঁদপুর রেল ষ্টেশন জনশূন্য হয়ে যায়। তারপর তারা ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে "ট্রাং রোড" ধরে চট্টগ্রামের দিকে হেঁটে এগিয়ে আসতে সুরু করে। পথেই কুমিল্লা থেকে মোটরে আগত পুলিশের হাতে তারা হঠাৎ অপ্রস্তুতভাবে ধরা পড়ে যায়। প্রথম বিচারে সেসন-কোর্ট দু'জনেরই ফাঁসীর হুকুম দেয়। পরে হাইকোর্টের আপীলে অন্ততঃপক্ষে তাদের তরুণ বয়স বিবেচনায় উকিলরা তাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ না দিয়ে অন্য শাস্তির জন্য আবেদন করেন। হাইকোর্টের রায়ে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রাণদণ্ডের আদেশ বহাল থাকে। কালীপদ চক্রবর্তীর প্রাণদণ্ডাদেশ মওকুব হয় ও তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি দেওয়া হয়। যদিও তারা দু'জনেই প্রায় এক বয়সী এবং যতদূর জানা যায় কালীপদ চক্রবর্তী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিল, তবু বিচারপতিরা রামকৃষ্ণকে অনুকম্পা দেখাতে স্বীকৃত হন না। কালীপদ চক্রবর্তীর তখন গোঁফদাড়ি ওঠেনি আর শরীরও খুব বলিষ্ঠ দেখাত না। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের স্বাস্থ্য ছিল খুব ভাল। তার পেশীবহুল সুঠাম দেহ ও মুখে ঘন গোঁফ দেখে তার সঠিক বয়সের চেয়ে বেশী দেখাচ্ছিল বলে তাঁর ফাঁসীর আদেশ পরিবর্তন হয় না।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে কলিকাতা আলীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়েছিল। ঐ জেলেই তখন আর একজন বিপ্লবী মৃত্যুদণ্ড নিয়ে ফাঁসীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি ছিলেন ঢাকার বিপ্লবীদলের দীনেশ গুপ্ত। উপরে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলের এক বিশিষ্ট সদস্য ক্যাবলা (মনোরঞ্জন) রায়ের যে দেশপ্রেমিক পিসীমার উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি এই দীনেশ গুপ্তের নিকট-আত্মীয়া হিসাবে আলীপুরে প্রায়ই দীনেশ গুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন।

তারিণী মুখার্জির হত্যাকাণ্ডের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশের পরই প্রীতিলতা সর্বপ্রথম ঐ দুই বিপ্লবীর নাম জানতে পারে। তারপর তাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসীর হুকুম যখন বহাল থাকবে বলে পত্রিকা মারফত সে জানতে পারে, তখন থেকে রামকৃষ্ণের জন্য প্রীতিলতার দরদী মনে তার জন্য শ্রদ্ধা ও গভীর সহানুভূতি বিশেষভাবে জাগে।

দলের কাজে প্রীতিলতাকে মাঝে মাঝে ঐ পিসীমার বাসায় যেতে হত। পিসীমা একদিন প্রীতিলতাকে বললেন যে, আলীপুর জেলে তিনি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত দীনেশ গুপ্তের সাথে দেখা করতে গিয়ে শুনে এসেছেন, ঐ ফাঁসীর কুঠুরীর পাশেরটিতে চট্টগ্রামের বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকেও রাখা হয়েছে। মৃত্যুপথ-যাত্রী স্বাধীনতার জন্য ঐ দুই বিপ্লবীর মধ্যে পূর্ব-পরিচয় ছিল না। জীবনে যাদের সঙ্গে সংযোগ হয়নি, একই আদর্শের সূত্রে গাঁথা হয়ে এই দুই তরুণ দেশপ্রেমিকের মধ্যে মিলন সাধন করেছে মহান মরণ। পাশাপাশি কুঠুরীতে দিনরাত বন্ধ থেকে তারা দিন গণনা করে মৃত্যুর আর জীবনের শেষ আলাপ চলে মৃত্যুভয়হীন এই দু'টি তরুণের।

চট্টগ্রাম দলের সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনের কঠোর নিয়মানু-বর্তিতায়, দলের নির্দেশ ছাড়া কোন মেয়ের অন্য ছেলে-সদস্যের সঙ্গে কোন আলাপ করতে পারত না। তবু প্রীতিলতার মনে হল, নিজ মা বোন বাবা ভাইদের মত আপনজন থেকে বহুদূরে

কলিকাতার কারাগারে যে বিপ্লবী মৃত্যুর প্রহর গুণছে, ফাঁসীর পূর্বে তার সঙ্গে যদি একবার সে দেখা করতে পারত, সহযাত্রী ও ভগিনীর স্নেহমমতার স্নিগ্ধ প্রলেপ সে কিছুটা দিতে পারত। আর নিজেও সে লাভ করতে পারত প্রেরণা, মরণকে হেলায় জয় করার সাহস। ছাত্রীনিবাসের কক্ষে বসে কোনদিন নিভৃতে সে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ছবি কল্পনা করেছে, সারা অন্তর উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দনের পরম অর্ঘ্য।

একদিন সে পিসীমার কাছে তার ঐ ইচ্ছা প্রকাশ করে। পিসীমা পরামর্শ দেন দূর-সম্পর্কের বোন পরিচয়ে সে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে যদি আবেদন জানায়, তারা তার সঙ্গে রামকৃষ্ণের দেখার জন্য অনুমতি দিতে পারে। তা ছাড়া আবেদনে যেন উল্লেখ করা হয় যে তার সব আত্মীয়স্বজন বহুদূর চট্টগ্রামে থাকেন বলে তাঁরা এসে তার সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না, তাই বোন হিসাবে সে দেখা করতে চায়।

ঐভাবে আবেদন করার পরে প্রীতিলতা রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে তার ফাঁসী কুঠুরীতে গিয়ে দেখা করার অনুমতি পায়। একই আদর্শ-পথের দু'টি সহযাত্রী বিপ্লবী যে শুধু কেউ কাউকে কোনদিন আগে দেখেনি তা নয়, প্রীতিলতা যে বিপ্লবীদলের সদস্যা তাও রামকৃষ্ণ বিশ্বাস জানত না। দেখা করার জন্য জেলার যখন প্রীতিকে নিয়ে ফাঁসীর কুঠুরীর সামনে গিয়ে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে বললেন যে, তার সঙ্গে তার বোন দেখা করতে এসেছে তখন বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে সে তাকিয়ে রইল। কলিকাতায় কোন বোন থাকার কথা নয়। জেলার ও জমাদার সিপাহী যারা প্রীতিকে নিয়ে গেছে, তারা দেখল রামকৃষ্ণ ও প্রীতির দু'জনেরই গায়ের রং শ্যামল। তাদের মধ্যে জীবনে ঐ প্রথম দেখা তা তারা মোটেই সন্দেহ না করে উভয়কেই সহোদর ভাইবোন

অথবা অতি নিকটাত্মীয় বোন ফাঁসীর জন্য তৈরী ভাইকে দেখে এসে দুঃখে নির্বাক হয়ে গেছে মনে করল। জেলার ভদ্রলোক কিছুটা বয়স্ক ছিলেন। তিনি বললেন, তারা যেন আধ ঘণ্টার জন্য বসে কথা বলে, তিনি দূরে বসছেন। প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে উভয়ের মধ্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই আলাপ সহজ হয়ে ওঠে।

বিপ্লবীদলে যোগদানের পর থেকে প্রীতিলতার রোজনামচা লেখার অভ্যাস হয়। বাংলা লিখতে সে ভালবাসত। রোজনামচায় প্রথম দিকে সে লিখত তার মনের বিচিত্র চিন্তাধারা, কোন সময় কবিতা। কোনদিন আবার লিখতও না। আবার যেদিন রাতের নির্জনতায় সে তার খাতা নিয়ে বসত, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তার সুন্দর হস্তাক্ষরে ভরে উঠত, উচ্ছ্বাসে, বেদনায়, আশায় ও আকাঙ্ক্ষায়।

আলীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে প্রীতিলতার এই সাক্ষাতকার তার জীবনের এক বিশেষ রোমাঞ্চকর ঘটনা। পল পল করে মৃত্যুর ক্ষণ যার এগিয়ে আসছে, এই বিপুলা ধরণীর সুন্দর দীপ্তি যার জন্য যে-কোন দিন অকস্মাৎ লুপ্ত হয়ে যাবে, তেমন একটি মরণজয়ী বীরের সঙ্গে কথা বলা, মৃত্যুকে তুচ্ছ করার সুদৃঢ় পণের আভাস প্রত্যক্ষ করা, প্রীতিলতার বিপ্লবী জীবনে এক নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করল। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে জেলের মরণ কুঠুরীতে দেখা করে আসার পরে প্রীতিলতা তার রোজনামচায় লিখেছিল :

"বিপ্লবীদের জনৈক সহযাত্রী যখন আমাকে দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করার অপরাধে বৃটিশ আইনে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে বললেন, তখন আমি এক নতুন প্রেরণার শিহরণ বোধ করলাম। আমি তার এক

সম্পর্কিত বোন হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়ে কোনমতে এই হাস্যময় তরুণ বীরের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি যোগাড় করি। তার ফাঁসীর আগে তার সঙ্গে আমার প্রায় চল্লিশবার দেখা হয়েছে। তার সুসংযত দৃষ্টি, ভগবানে অগাধ বিশ্বাস, শিশুসুলভ সারল্য, আবেগপূর্ণ অন্তর, গভীর জ্ঞান ও বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাস আমাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। আমি আগের চেয়ে আরও দশগুণ বেশী শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা তার কাছ থেকে পাই। আমার জীবনাদর্শকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে মৃত্যুপথযাত্রী ঐ দেশপ্রেমিকের সাহচর্য আমাকে খুব সাহায্য করেছে। রামকৃষ্ণের ফাঁসীর পরই কোন বাস্তব বিপ্লবী কাজে যোগ দেবার জন্য আমার মনে বিশেষ আগ্রহ জাগে। কিন্তু বি-এ পাশ করার জন্য আরও নয় মাস আমাকে কলিকাতায় অপেক্ষা করতে হবে। টেষ্ট পরীক্ষার পর আমি বিপ্লবী কাজে যোগদান সম্পর্কে আলাপের জন্য একবার চট্টগ্রামে আসি।''

বি-এ নির্বাচনী পরীক্ষার পরে প্রীতিলতা যখন তার বাবা মাকে দেখবার নাম করে কয়েকদিনের জন্য চট্টগ্রাম এসেছিল তখন অস্ত্রাগার দখলের পরে আত্মগোপনরত বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ ও মিলিটারীর তৎপরতা খুব বেড়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে সন্দেহভাজন ছাত্র ও তরুণদের উপর নানারকম নির্যাতন চলছে, তাদের অভিভাবকরাও পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ ও জুলুম থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। গ্রেপ্তারের জন্য সরকারী পক্ষের পুরস্কার ঘোষণার অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপ্লবীদলের গোপনীয়তা আরও কঠোর হয়েছে, আত্মগোপনরত নেতা ও কর্মীদের অত্যন্ত সাবধানে স্থান পরিবর্তন করতে হচ্ছে। প্রীতিলতার সঙ্গে যে তরুণ বিপ্লবী আত্মীয় ভাইটির মারফত

সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদার সংযোগ রক্ষা করা হত, সেও কিছুদিন পূর্বে জনৈক বিশ্বাসঘাতকের অর্থলাভের দরুন ধৃত হয়েছিল। অন্য যেসব ছাত্র ও তরুণকে প্রীতিলতা বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত বলে জানত, তাদের একজনকে গোপনে ডেকে এনে, সে তাকে বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করে। কিন্তু সেবার মাষ্টারদা তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ করতে পারেন না।

প্রীতিলতা বি-এ-তে 'দর্শনে' অনার্স নিয়েছিল আগেই বলা হয়েছে। বেথুন কলেজে সে ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় প্রায় সব বিষয়েই প্রথম দিকে প্রথম স্থান অধিকার করত। বি-এ শেষ বর্ষ থেকেই ঘটল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল, জালালাবাদ সংঘর্ষ ও সেই যুদ্ধে তার আত্মীয় দাদার শহীদ হওয়ার সংবাদ। তখন থেকে তার লেখাপড়ায় এল শৈথিল্য। এবার রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসীর পর থেকে সে বি-এ পরীক্ষা না দেওয়াই স্থির করে ফেলে।

সে ভাবতে থাকে, মাতৃভুমির পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য যখন চলছে সশস্ত্র সংগ্রাম, বিপ্লবীরা পাঞ্জা ধরছে মৃত্যুর সঙ্গে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্নাতক উপাধিলাভের কি মুল্য আছে? সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসনে সুপরিকল্পিত উপায়ে দেশের শতকরা নব্বইজন নরনারীকেই ত মূর্খ রাখা হয়েছে। তাদের শোষণ ও লুণ্ঠনকে শেষ করার জন্য, এই জঘন্য ঔপনিবেশিক শক্তিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে মুক্ত স্বাধীন স্বদেশ প্রতিষ্ঠা করার বিপ্লবী ও ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনই আজ মুখ্য; পরীক্ষা পাশ করা এমন কিছু জরুরী নয়। তার বিপ্লবী সাথী ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীরা তাকে বলে, দুই বছর যখন সে পড়েছে, সেজন্য অনেক অর্থব্যয়ও

হয়েছে, তখন পরীক্ষা তার দেওয়াই ভাল হবে। পরীক্ষা শেষ করে সে বিপ্লবের কাজে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারবে।

সকলের অনুরোধে প্রীতিলতা পরীক্ষা দেয় কিন্তু 'অনার্স' পরীক্ষায় সে যোগ দেবে না বলে আগেই কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়। এই পরীক্ষায় সে যখন সম্মানের সঙ্গে ("ডিস-টিন্‌ক্‌সনে") পাশ করল, তখন অন্যান্যদের চেয়ে সে নিজেও বেশী অবাক হয়েছিল।

বি-এ পরীক্ষার পরে প্রীতিলতা চট্টগ্রামে ফিরে এলে তার বাবা মা নিজেদের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে কাছে পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হলেন। ছোট ভাইবোনেরাও মমতাময়ী এই বড় বোনের সঙ্গ সব সময় পাবে জেনে খুশী হল। কিন্তু আগের প্রীতিলতা যেন নেই। সদাহাস্যময়ী এই মেয়েটির মুখে কি এক গভীর চিন্তার ছাপ, চোখের দৃষ্টি উদাস। তার ছাত্রীনিবাস ও কলেজী জীবনের খুঁটিনাটি কাহিনী সে আগের মত সোৎসাহে আর বর্ণনা করছে না। এক নূতন প্রীতিলতার রূপ পরিবারের সকলের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

অতীতে ম্যাট্রিক ও আই-এ পরীক্ষার পরে তার প্রৌঢ় পিতা যেমন তার বিবাহের প্রচেষ্টা করছিলেন, এবারও তা সুরু হল। মধ্যবিত্ত পিতার দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া কন্যাও তখন সামাজিক বিচারে বিবাহযোগ্য হয়ে উঠেছে। তাই তিনি ক্রমে ক্রমে এক একটিকে পাত্রস্থ করে ভার লাঘব করতে চান।

এদিকে প্রীতিলতা ফিরে আসার পর থেকেই মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। এবার তাকে জানানো হয় যে, তিনি কিছুদিনের মধ্যেই তার সঙ্গে সাক্ষাত করবেন। প্রীতিলতা ফিরে আসবার পরে একই উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের বিপ্লবী

ছাত্রী কল্পনা বেথুন কলেজ থেকে বদ্‌লী-পত্র নিয়ে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হয়। তখন নূতন একটি মধ্য ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় একজন দানশীল ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির উদ্যোগে চট্টগ্রামের নন্দনকানন * এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রীতিলতা ঐ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হয়।

ভগিনী পরিচয়ে প্রীতিলতা যে শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে ফাঁসীর আগে কয়েকবার দেখা করতে পেরেছিল তা চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতারা আগেই খবর পেয়েছিলেন। মাষ্টারদা প্রীতির কাছে থেকে তার বিবরণ শোনবার জন্যও উৎসুক ছিলেন। অন্যদিকে প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত দুজনই চট্টগ্রামে ফিরবার পর থেকে প্রত্যক্ষ কাজ করার জন্য দাবী প্রকাশ করে চলেছে।

অবশেষে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের তৎকালীন অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ধলঘাটের এক গোপন ঘাঁটিতে সূর্য সেনের সঙ্গে প্রীতিলতার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়। শহর থেকে সাবধানে সে তার নিজ গ্রামের বাড়িতে যাবার নাম করে চলে যাবে এবং সন্ধ্যার পরে নির্দিষ্ট স্থানে তাকে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। মাষ্টারদা সূর্য সেন ও অন্যতম প্রধান নেতা নির্মল সেন সেখানে মিলিত হবেন স্থির হয়।

ধলঘাট গ্রামের ঐ ছোট বাড়িটি মাটির দোতালা। এক গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ি। মৃত্যুর পরে তাঁর প্রৌঢ়া বিধবা সাবিত্রী দেবী তাঁর ছেলে রামকৃষ্ণকে নিয়ে থাকেন। কিছুদিন পূর্বে তাঁর যে ছোট মেয়েটির বিবাহ দেওয়া হয়েছিল, সে কয়েক দিনের জন্য মায়ের কাছে বেড়াতে এসেছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ

---

* পরে তাঁর দানে ঐ বিদ্যালয়টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং বর্তমানে এটি চট্টগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বালিকা শিক্ষায়তন : "অপর্ণাচরণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়" নন্দনকানন।

যুদ্ধের পর থেকেই এই গ্রামে এক মিলিটারী ক্যাম্প বসেছে * জেলা-বোর্ডের বড় সড়ক ঘেঁসে। ক্যাম্পের অপর দিকে ছিল বোর্ড আপিস। ক্যাম্পের কোণায় এক প্রাচীন বটগাছ। পাশে বাঁধানো ঘাট-দেওয়া দুর্গাদাস দস্তিদারের ** বড় পুকুর। ঐ ক্যাম্পে থাকত কুড়ি জনের মত সশস্ত্র পুলিশ, আত্মগোপনরত বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টায় দিনে রাতে যখনই দরকার এই ক্যাম্প থেকে গিয়ে ঘরবাড়ি খানাতল্লাসী করা হত। বিভিন্ন বাড়ি অথবা স্কুল থেকে সন্দেহভাজন কিশোর ও ছাত্রদের এই ক্যাম্পে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা ও নানা রকম অকথ্য নির্যাতন চালানো হত। কখনও কঠিন শীতের রাতে তাদের কাউকে ঐ পুকুরের গলাজলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হত। ঐ অবস্থায় তাদের ইচ্ছানুযায়ী স্বীকারোক্তি করার জন্য পুলিশের লোক ছাত্র বা যুবকদের মাথার উপর লাঠির আঘাত দিতে থাকত। কখনও স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ধৃত ছাত্র বা কিশোরের দু'পায়ে লম্বা দড়ি বেঁধে তার অন্য প্রান্ত ঐ ক্যাম্পের পাশের প্রাচীন বটবৃক্ষের উঁচু এক ডালে ছুঁড়ে দিয়ে দড়ি টেনে তাদের পা উপর দিকে এবং মাথা নীচের দিকে করে ঝুলিয়ে রাখা হত। মাঝে মাঝে দড়ি ঢিলা করে দিয়ে ঐ অবস্থায় তাদের মাথা নীচে মাটিতে ঠোকর দিয়ে যন্ত্রণা দিয়ে আবার দড়ি টেনে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হত। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে সেদিনকার ছাত্র, কিশোর,

---

* সেই ঘটনার ৪০ বছর পরও ক্যাম্প যথাস্থানে ধলঘাট গ্রামে অধিষ্ঠিত আছে। তবে তাতে এখন আগের মত সশস্ত্র পুলিশ নেই।

** ১৮৬২ ইং ১২ই ফেব্রুয়ারী তরুণ আইনজীবী দুর্গাদাস দস্তিদারের ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত আয়কর আইনের বিরুদ্ধে দরখাস্ত লেখার অপরাধে এক মাসের জেল হয়।

তরুণদের দুঃখ নির্যাতন বরণের নীরব সাক্ষী হিসাবে আজও সেই বুড়ো বটগাছ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। আজও ঋতুতে ঋতুতে তার শাখায় শাখায় জেগে ওঠে নূতন প্রাণের বার্তা নিয়ে কচি কিশলয়। নূতন ভবিষ্যতকে আনার সংগ্রামে সেদিনকার এইসব কচি মানুষগুলির দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের নিষ্ঠা এত গভীর ছিল যে শত অত্যাচারেও তাদের মুখ থেকে একটি কথাও প্রকাশ হয়ে পড়েনি। অত্যাচারকে ব্যর্থ করে দিয়ে তারা যখন ঘরে ফিরে যেত, তখন আবার বিপ্লবীদলের নির্দেশে তারা সব কাজ করত।

এমন অত্যাচার ও বিভীষিকার কেন্দ্র ছিল ঐ ধলঘাট ক্যাম্প। তা সত্ত্বেও ঐ ক্যাম্পের কাছেই গ্রামের অন্যান্য হিন্দু মুসলমান চাষী ও মধ্যবিত্তদের বাড়ীতে আত্মগোপনরত বিপ্লবীদের আশ্রয় মিলত। প্রৌঢ়া বিধবা ব্রাহ্মণ মহিলা সাবিত্রী দেবীর বাড়ী ছিল। ঐ ক্যাম্প থেকে দশ মিনিটের পথ। তাঁর বাড়ীতে কোন সময় অল্পদিনের জন্য কোন বিপ্লবী আত্মগোপনে ছিল, অথবা কখনও বিভিন্ন স্থান থেকে গোপনে ঐ বাড়ীতে দলীয় জরুরী বৈঠকের জন্য বিপ্লবীরা মিলিত হত।

১৯৩২-এর ১৩ই জুন। সাবিত্রী দেবীর বাড়ীতে এসে সন্ধ্যার পরই পৌঁছে গেছেন প্রধান নেতা সূর্য সেন ও নির্মল সেন। প্রীতিলতাকে নিয়ে তারপর এসে পৌঁছায় তরুণ বিপ্লবী অপূর্ব (ভোলা সেন)।

সাবিত্রী দেবী তাঁদের বৈঠকের ব্যবস্থা করেছেন তাঁর বাড়ীর দোতলায়। তাঁর বাড়ীর পিছন দিকে ছিল পানায় ভরা গড়। গ্রামের অনেক বাড়ীতেই নিরাপত্তার জন্য ছিল জল ও পানায় ভরা গড়। বর্ষায় ঐসব গড় জলে ভরে যেত এবং অন্য সময় জল কিছু কমে গেলেও একেবারে তা শুকিয়ে

যেত না। আকস্মিক কোন বিপদ ঘটে গেলে বাড়ীর পিছন দিকে ঐ গড়ের সাহায্যে তারা যেন আত্মরক্ষা করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করে রাখা ছিল।

সাবিত্রী দেবীর মেয়ে স্নেহলতা এর আগে প্রীতিলতাকে কোনদিন দেখেনি। শহরের মেয়ের পোষাক ও চালচলনে যে বৈশিষ্ট্য, গ্রামের এই গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে সেদিকে মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে দেখে। সে ধরে নেয় ওটি খুব বড়লোকের মেয়ে হবে। তার মা'র কাছে সে শুনেছে, ঐ একটি রাতের জন্যই ওরা এসেছে, ভোর হবার আগেই সবাই চলে যাবে। একটু পরে তার মা তাকে পাশের বাড়ী থেকে কয়েকটি হাঁসের ডিম নিয়ে আসতে বলে।

পাশের বাড়ীর লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করে, এত রাতে তাদের বাড়ীতে আবার কোন্ অতিথি এল। বাড়ীর মালিক ছিল সরকারী এক ধামাধরা ছোট ভূস্বামী। সে মনোযোগ দিয়ে স্নেহলতার কথাবার্তা শুনতে থাকে। স্নেহলতা বলে, তাদের বাড়ীতে শহরের একটি মেয়ে, দু'জন বয়স্ক লোক ও একটা ছেলে এসেছে। তাঁরা এখন খাবে, তাই তার মা ডিম নেবার জন্য তাকে পাঠিয়েছে। বাড়ীর মালিকটি মাঝে মাঝেই আগে সাবিত্রী দেবীর বাড়ীতে লোক আসা লক্ষ্য করেছে, সেজন্যে তাঁর উপর লোকটির কিছুটা সন্দেহ ছিল। বিরাট অংকের অর্থ পুরস্কার লাভের লোভও তার যথেষ্ট ছিল। তার ধারণা হল, সাবিত্রী দেবীর বাড়ীতে বড় কোন বিপ্লবী হয়ত এসেছে। তাই সে গিয়ে ধলঘাট ক্যাম্পে খবর দেয়।

এদিকে প্রীতিলতার ইচ্ছা ঐদিনই সে নেতাদের নিজহাতে রেঁধে খাওয়াবে। খাওয়ার পরেই বৈঠক শুরু হবে।

আঠার উনিশ বছরের তরুণ বিপ্লবী অপূর্ব সেন ছিল অত্যন্ত উচ্ছল ও প্রাণবন্ত। সে বসে ছিল রান্নায় সে প্রীতিলতাকে সাহায্য করবে। এই সম্পর্কে প্রীতিলতার রোজনামচায় লেখা ছিল :

"সেদিন সকালেও ভোলার (অপূর্ব সেন) জ্বর নিয়ে সে কত হাস্যকৌতুক করেছে। আনন্দের এই নির্ঝরকে যতই দেখছিলাম, মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম। নির্মলদা (বিপ্লবী নেতা নির্মল সেন—লেখক) বলছিলেন, এই ভোলা হল মাষ্টারদার 'এ্যাসিষ্ট্যান্ট'। ও বেশ ইংরেজী জানে। ওকে দিয়ে তিনি কত কিছু লেখান। ভোলা এর মধ্যে হঠাৎ একদিন বাড়ী গিয়েছিল। বাড়ীতে তার অনেকগুলি বৌদি। বাড়ী থেকে চলে আসার সময় সে বৌদিদের ডেকে বলল, তোমরা সব 'ফল ইন' কর, আমি নমস্কার করব—আমার 'কমাণ্ড'—বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল অপূর্ব। আজ ভাবছি, ঐ রকম করে বিদায় নেওয়া তারই সাজে।

---ঐদিন সাগু ঠাণ্ডা করে অপূর্বকে খাওয়ালাম।

আমার হাতে জীবনের শেষ খাওয়া সে খেয়ে নিল। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হলে খেতে বসতে যাব, তখনই মাষ্টারদা বললেন "পুলিশ," "পুলিশ"। মাষ্টারদাকে বললাম, আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকব। তিনি চোখ বড় বড় করে বললেন, নীচে মেয়েদের মধ্যে চলে যাও, তাদেরই আত্মীয় বলে পরিচয় দিও। উপরে রইলেন মাষ্টারদা, নির্মলদা আর ভোলা। ক্যাপটেন ক্যামেরন তখন সিঁড়ি বেয়ে রিভলভার হাতে উপরে উঠছে। নির্মলদা দাঁড়িয়ে তাকে গুলী করলেন। সাহেব ক্যাপ্‌টেন ক্যামেরন গুলীবিদ্ধ হয়ে নীচে পড়ে গেল। তারপর দু'দিক থেকে কিছুক্ষণ গুলী চলল।

এমন সময় মাষ্টারদা ভোলাকে নিয়ে নীচে নেমে এলেন। মাষ্টারদার পাশে তখন ভোলা দাঁড়িয়ে। এত বিপর্যয়েও তার চোখে-মুখে কোন চাঞ্চল্য নেই, দেখে কি চমৎকার লেগেছিল। রিভলভারের ট্রিগারে হাতটি রেখে মাষ্টারদার আদেশের অপেক্ষায় আছে। মাষ্টারদা বললেন 'চলো'। আমরা তিনজন রওনা হলাম। পিছন দিক দিয়ে বেরোবার সময় শুক্নো পাতার উপর 'খস্' 'খস্' শব্দ হতেই অন্ধকারের বুক চিরে এক গুলী এসে অপূর্বর বক্ষভেদ করল। আমি আর মাষ্টারদা অন্ধকারে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলাম। রামকৃষ্ণদা বলেছিলেন, ভোলার সঙ্গে আলাপ করতে। আলাপের চূড়ান্ত হয়ে গেল। গত দু'দিন ওর সঙ্গেই ছিলাম। তখন তার হাসিই কেবল শুনেছি। অবশেষে আমারই দু'চোখের সামনে সে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।"

রান্না শেষ করার পরে বিপ্লবী নেতাদের জন্য যখন প্রীতিলতা খাওয়ার আয়োজন করেছিল, তখনই ধলঘাট ক্যাম্প থেকে ইংরেজ কাপটেন ক্যামেরনের নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র বাহিনী এসে সাবিত্রী দেবীর বাড়ীর উপর চড়াও হয়। বাড়ীর পিছন দিক দিয়ে যে পালাবার ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তার সাহায্যে সবার আগে সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন ও প্রীতিলতাকে বাঁচাবার চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত হয়। বিপ্লবী নেতা নির্মল সেন দোতালায় গুলীভরা রিভলভার হাতে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। নীচে ঐ বাহিনীকে ভ্রূক্ষেপ না করেই মহীয়সী নারী সাবিত্রী দেবী তাদের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালেন।

চিৎকার করে তিনি বলে উঠলেন, তিনি এক বিধবা বুড়ী মেয়েমানুষ, যুবতী মেয়ে তাঁর কাছে রয়েছে। এমন হামলা রাতের বেলায় কেন তাঁর বাড়ীর উপর হবে? যতই পুলিশের

লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছে, বাড়ীর মধ্যে বাইরের লোক কে আছে তাদের বের করে দেওয়া হোক, ততই দারুণ ক্রোধে ফেটে পড়ে সাবিত্রী দেবী বলেছেন, যত সব বাজে কথা বলতে এসেছ তোমরা, কেউ নেই। তোমরা শুধু শুধু মেয়েদের উপর জুলুম চালাতে এসেছ।

এর ফলে যে সামান্য কিছু সময় পাওয়া যায়, তার সাহায্যে মাষ্টারদা, অপূর্ব সেন ও প্রীতিলতা আস্তে আস্তে বাড়ীর পিছনদিকে পানাভরা গড়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সেদিকেও সশস্ত্র পুলিশ কিছু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে বাড়ী ঘেরাও করে রেখেছিল। রাত ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। তাই প্রীতিলতাদের খুব সুবিধা হচ্ছিল। গাছতলা দিয়ে যেতে হঠাৎ শুকনো পাতার উপর যেই খস খস শব্দ হল, অন্ধকারে দাঁড়ানো এক সশস্ত্র পুলিশ শব্দ লক্ষ্য করে আন্দাজে গুলী চালায় এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ গুলী এসে লাগে তরুণ বিপ্লবী অপূর্ব সেনের বুকে। মাষ্টারদা ও প্রীতিলতা কোনমতে গিয়ে গড়ে নেমে পড়েন। অন্ধকার ঐ রাতে পানাভরা ময়লা ও বদ্ধ জলের মধ্যে নিঃশ্বাস নেবার জন্য নাকটি কোনমতে তুলে রেখে মাষ্টারদা ও প্রীতিলতা অনেকক্ষণ নিজেদের লুকিয়ে রেখেছিলেন।

ঐদিকে কয়েকমিনিট জিজ্ঞাসাবাদের পরই বাইরের দিক থেকে খোলা রিভলভার হাতে উদ্ধত ভঙ্গীতে যখনই সিঁড়ি দিয়ে ক্যাপটেন ক্যামেরন কয়েক ধাপ উঠেছে, তখন বিপ্লবী-নির্মল সেনের অব্যর্থ গুলীতে তার বিকৃতমুখ প্রাণহীন দেহ গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়। হামলাকারী বাহিনীর ঐ ইংরেজ নেতার বিপর্যয়ে ভাড়াটিয়া সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা ক্ষণিকের জন্য বিমূঢ় হয়ে পড়ে। একটু পরেই শুরু হয়ে যায় ছাদ লক্ষ্য করে প্রচণ্ড গুলীবর্ষণ। নির্মলদা আহত হয়েও যতক্ষণ তাঁর

রিভলভারের শেষ গুলী ছিল ততক্ষণ লড়তে লড়তে ঐ ছাদেই রক্তাপ্লুত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পুলিশ বিপ্লবীনেতা নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনের মরদেহ সাবিত্রী দেবীর উঠানে নিয়ে আসে। সাবিত্রী দেবী, তাঁর ছেলে রামকৃষ্ণ ও মেয়ে স্নেহলতাকে গ্রেপ্তার করে সেখানে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে রাখে। তারপর দলপতি ক্যামেরনের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁর বাড়ীখানা ধ্বংস করে ফেলে। তারপর বিপ্লবী দু'জনের লাশও তাদের ধলঘাট ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়।

চারিদিক যখন নিস্তব্ধ হয়ে আসে তখন গড়ের মধ্য থেকে মাষ্টারদা ও প্রীতিলতা উঠে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে অন্য একটি গোপন আশ্রয়-কেন্দ্রে গিয়ে উঠেন।

বিচারে সাবিত্রী দেবী ও তাঁর ছেলে রামকৃষ্ণের চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়, মেয়ে স্নেহলতা খালাস পায়। মাতা পুত্র দুজনকেই মেদিনীপুর (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে) কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়েছিল। সেখানে কিছুদিন রোগ ভোগের পর রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। জেলের 'জেনানা ফাটকে' সাবিত্রী দেবী দাবী করেন, তিনি নিজে রান্না করে খাবেন এবং নিজহাতে রান্না করে তাঁর খাওয়ার ব্যবস্থা যদি কর্তৃপক্ষ না করে, তাহলে তিনি কিছু খাবেন না। তারা বলে, সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে জেলের সাধারণ খাদ্য তাঁকে গ্রহণ করতেই হবে।

সাবিত্রী দেবী বলেন, তিনি সেসব বোঝেন না। তিনি রাজনৈতিক মামলার বন্দী। তাঁর দাবী না মানা পর্যন্ত তিনি অনশন ধর্মঘট করেন। ঐ সময় জেল কর্তৃপক্ষ তাঁর উপর অনেক অত্যাচার চালায়। কিন্তু এই নিরক্ষর প্রৌঢ়া মহিলার অটুট মনোবল, দুর্জয় সাহস ও অম্লান দেশপ্রেম শেষ পর্যন্ত জয়লাভ

করে। জেল কর্তৃপক্ষকে তাঁর জন্য রান্নার সমস্ত নূতন পাত্রাদি দিয়ে তাঁর নিজে রান্নার ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়।

ধলঘাট সংঘর্ষে একদিকে চট্টগ্রাম-বিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান নেতা নির্মল সেন ও বিপুল ভবিষ্যত সম্ভাবনাময় তরুণ বিপ্লবী অপূর্বকে যেমন আত্মাহুতি দিতে হয়, অন্যদিকে আমরা দেখি মহীয়সী মাতা সাবিত্রী দেবীর গভীর দেশপ্রেম ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সেইদিন রক্ষা করতে পেরেছিল, মহানায়ক সূর্য সেন ও প্রীতিলতাকে।

প্রাণভয় তুচ্ছ করে একজন বাঙ্গালী মাতা যেভাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে সহায় হয়েছিলেন, তেমন কত মাতা, বধূ ও ভগিনী সবার অলক্ষ্যে এমনভাবেই আত্মত্যাগ করেছিলেন, চরম লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন। বিদেশী শাসন থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য বিভিন্নভাবে ও পথে যে সংগ্রাম প্রায় এক শতাব্দীর মত বাংলা ও ভারতের মানুষ করেছিল, তার মধ্যে এমন কত সাবিত্রী দেবীর কথা আমরা জানি না। এদের কথা ভেবেই বিদ্রোহী কবি নজরুল লিখেছিলেন :

"জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন্ রণে কত খুন্ দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে।"

ইংরেজ সামরিক ক্যাপটেন পরিচালিত সশস্ত্র বাহিনীবেষ্টিত তাঁর জীর্ণ গৃহের সামনে দাঁড়িয়ে সেই পুলিশী সন্ত্রাসের যুগে একা সাবিত্রী দেবী যেভাবে বিপদ ও ভয়কে উপেক্ষা করেছিলেন, তার কাহিনী আজিকার মাতা ভগিনীদের অন্তরে আদর্শ উপলব্ধি ও প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে যাবার প্রেরণা দেবে। কারাগারে একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে মুক্তিলাভের পরে তিনি তাঁর গ্রামের ছেলেদের

বলেছিলেন, আমার এক ছেলেকে হারিয়ে আজ আমি তোমাদের পেয়েছি, হাজার ছেলের মা হয়েছি।

কারাভোগের পর গ্রামে ফিরে এলে দেশপ্রেমিক কৃষক ও তরুণরা উদ্যোগী হয়ে তাঁর জন্য একটি ঘর তৈরী করে দিয়েছিল। গ্রামের বিভিন্ন পরিবারের মেয়ের কিছু কিছু তৈজসপত্র, কাপড়-চোপড়, বিছানা ইত্যাদির তাঁর জন্য সানন্দে দান করেছিল। তাঁর জন্য গ্রামের ছেলেরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করত।

১৯৪৮ সালে এই দেশপ্রেমিক মহিলা চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন।

৭

ধলঘাট সংঘর্ষের পরে প্রীতিলতা গোপনে আবার শহরে তার পিত্রালয়ে ফিরে আসে এবং নন্দনকানন অপর্ণাচরণ মধ্য ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ে তার প্রধান-শিক্ষিকার কাজে যোগ দেয়। কিন্তু তার চোখের সামনেই যে মহান মরণ সে লক্ষ্য করেছে, তারপর থেকে তার মনও হয়ে উঠেছে মৃত্যুপাগল। দেশকে স্বাধীন করার জন্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র অভিযান হয়ে গেছে জালালাবাদ পাহাড়ে, তাকে সাফল্যের শেষ লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হবে, অন্যান্য বিপ্লবীদের মত প্রীতিলতারও এই কঠিন পণ। বাংলার বিপ্লবীদলের সশস্ত্র বিপ্লবাদর্শ রূপায়ণের যে প্রচেষ্টা ১৯০৭-১৯০৮ সাল থেকে সুরু হয়েছিল, তারপরে প্রায় ২৫ বছরের মধ্যেও কোন মেয়ে-বিপ্লবী সাক্ষাত লড়াইয়ে যোগ দিল না, ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করল না, সংগ্রামে শহীদ হওয়ার সৌভাগ্যলাভ করল না—এই বেদনায় প্রীতিলতা অধীর হয়ে উঠেছিল।

১৯৩০ সালের অভিযানের পর গত দুই বছর ধরে প্রীতিলতা সাক্ষাত বিপ্লবী কোন কাজে যোগদানের দাবী জানিয়ে এসেছে।

কলিকাতার বিদেশী হোটেল আক্রমণ পরিকল্পনায় অন্যান্য কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে প্রীতিলতার নামও স্থির হয়েছিল। তখন তার আনন্দের সীমা ছিল না।

ধলঘাট সংঘর্ষের পূর্বে সাবিত্রী দেবীর বাড়ীতে প্রীতিলতা মাষ্টারদা ও নির্মলদার সঙ্গে যৎসামান্য আলাপ করারই সুযোগ পেয়েছিল। শহীদ রামকৃষ্ণের সঙ্গে তার কি কি আলাপ হয়েছে, নেতারা তার মুখ থেকে তা শুনতে চেয়েছিলেন। তবে প্রত্যক্ষ বিপ্লবী কাজে যোগদানের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে প্রীতিলতা যে প্রধান নেতাদের কাছে প্রকাশ করতে পেরেছিল, তা বোঝা যায়। কারণ কিছুদিন পরই মাষ্টারদা তাকে আত্মগোপনে যাবার জন্য নির্দেশ পাঠান। প্রায় একই সময়ে বিপ্লবী কল্পনা দত্তকেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়। কিছুদিন পূর্বে পুরুষের ছদ্মবেশে কল্পনা দত্ত একজন ছাত্র-বিপ্লবীর সঙ্গে কোন গোপন কাজে যাওয়ার পথে পাহাড়তলীর ভেলুয়ার দীঘির পাড়ে ধরা পড়েছিল। ঐজন্য কল্পনা ও সেই ছেলেটির বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের হলে, হাকিম কল্পনাকে জামিনে মুক্তি দেন। ঐ জামিনে থাকা অবস্থায়ই কল্পনা দত্তকে অনেক কষ্টে দলের নির্দেশে আত্মগোপনে যেতে হয়েছিল। এই দু'জন মেয়ে-বিপ্লবী তরুণীর এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের চেয়ে ঐরকম বয়সের মেয়েদের তখনকার সামাজিক অবস্থায় আত্মগোপনে নেওয়ার গুরুতর সিদ্ধান্তের দ্বারা বোঝা যায়, মাষ্টারদা সূর্য সেন তখন মেয়েদের প্রত্যক্ষ বিপ্লবী কাজে পাঠাবার জন্য স্থির করে ফেলেছিলেন।

১৯৩০-এর ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম-বিপ্লবীরা যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, তার অন্যতম ছিল চট্টগ্রাম ইউরোপিয়ান (বর্তমানে 'চট্টগ্রাম ক্লাব') ক্লাব আক্রমণ এবং সেখানে আনন্দ-উৎসবমত্ত ইংরেজদের উপর বোমা, রিভলভার ইত্যাদি নিয়ে

ঝাঁপিয়ে পড়ে যত বেশী সংখ্যক তাদের হতাহত করা। কিন্তু ঐ তারিখে খৃষ্টানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব "গুড ফ্রাইডে" হওয়ায়, ঐদিন ক্লাব বন্ধ ছিল এবং সেজন্য ঐ কর্মসূচী সেদিন বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু বিপ্লবীদলের সদস্যরা ঐ বিশেষ কার্যসূচীকে কিছুতেই বিস্মৃত হননি। চট্টগ্রামে ঐ ক্লাবটির বাইরে একটি ফলকে ইংরেজিতে লেখা ছিল,-"কুকুর ও ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ"। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী সরকার এই দেশের মানুষকে শোষণ করে তাদের হাড় ও রক্ত দিয়ে মুনাফার যে স্বর্ণ-সৌধ বৃটেনে গড়ে তুলছিল, তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলি বিশ্লেষণ করার মত সচেতনতা তখনও দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। বৃটেনের যেসব মানুষকে তারা তাদের চোখের সামনে দেখে, নিষ্ঠুর শোষণ-নিপীড়নের প্রতীক ঐসব মানুষগুলির বিরুদ্ধে রুদ্ধ আক্রোশে তারা ফেটে পড়ে।

চট্টগ্রাম শহরের দামপাড়া অঞ্চলে ঐ ক্লাব আক্রমণ ও তার ব্যর্থতার সংবাদ ইংরেজরা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রাণভয়ে তারা বেশ কিছু দিনের জন্য নৈশ আনন্দ উপভোগ স্থগিত রাখে।

কয়েক মাস পরে রেলওয়ে কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবকে শহরের সকল ইংরেজ নরনারীর ক্লাব হিসাবে ব্যবহার করা হতে থাকে। নির্ভাবনায় তারা থাকতে পারে না। কখন আবার বেপরোয়া বিপ্লবীরা এসে অঘটন ঘটিয়ে ফেলে, সেজন্য সন্ধ্যার পর থেকে ঐ ক্লাব যখন খোলা থাকত ও ইংরেজ নরনারীরা নৃত্য ও অন্যান্য খেলাধূলায় ব্যস্ত থাকত, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু সশস্ত্র পুলিশ ক্লাবটিকে চারদিক থেকে পাহারা দিত।

আত্মগোপনরত তরুণ বিপ্লবীরা তখন ঐ ক্লাব আক্রমণ করার জন্য বার বার আগ্রহ প্রকাশ করছিল। শেষ পর্যন্ত তরুণ বিপ্লবী শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একদল বিপ্লবীকে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ প্রচেষ্টা সফল হয় না। তার কিছুদিন পরে কাট্টলীর বঙ্গোপসাগরের উপকূলে নিজের রিভলভারের গুলীতে শৈলেশ্বর চক্রবর্তী আত্মহত্যা করে। আক্রমণে ব্যর্থতার বেদনা সম্ভবতঃ তরুণ এই বিপ্লবীর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি।

চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় চার মাইল উত্তর-পশ্চিমে সাগর-কূলে এই কাট্টলী গ্রাম। এই গ্রামে প্রধানতঃ বিপ্লবী শান্তি চক্রবর্তীর* প্রচেষ্টায় বিপ্লবীদলের একটি শক্ত ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পুর্বে ও পরে এই গ্রামের হিন্দু মুসলিম অনেক মধ্যবিত্ত ও কৃষকের বাড়ী পলাতক বিপ্লবীদের অতি নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল।

পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পরে, প্রধান নেতা এই কাজটি কার্যকরী করার জন্য নূতনভাবে চিন্তা করতে থাকেন। তিনি সম্পূর্ণ নূতন আর একদল বিপ্লবীর

---

* ১৯৩৩ সালে পটিয়া থানার গৈরলা গ্রাম থেকে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ১৫,০০০ (পনর হাজার) টাকা পুরস্কার-ঘোষিত প্রধান নেতা সুর্য সেন যখন পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন, তখন পুলিশের বেড়াজাল থেকে বিপ্লবী শান্তি চক্রবর্তী ও কল্পনা দত্ত বেরিয়ে যেতে পারে। পরে ধৃত হলে শান্তি চক্রবর্তীর ৪ বৎসর কারাদণ্ড হয়। মুক্তিলাভের পরে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে তিনি কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪৩ সালে যক্ষ্মারোগে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে শান্তি চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়।

উপর এই কাজ সফল করার জন্য দায়িত্ব দেবেন স্থির করেন। মেয়ে-বিপ্লবীরা অনেক দিন ধরে প্রত্যক্ষ কাজে যোগ দেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে আসছে, সে কথাও প্রায়ই তাঁর মনে পড়ে। এবার একটি মেয়েকেই তিনি ঐ ক্লাব আক্রমণের নেত্রী করবেন ঠিক করলেন। তখন তিনি বলেছিলেন :

"বাংলার বীর যুবকের আজ অভাব নাই। বালেশ্বর থেকে জালালাবাদ কালারপুল পর্যন্ত এদের দীপ্ত অভিযানে দেশের মাটি বারে বারে বীর যুবকের রক্তে সিক্ত হয়েছে। কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে মায়ের জাতিও যে শক্তির খেলায় মেতেছে, ইতিহাসে সে অধ্যায় রচিত হোক এই-ই আমি চাই। ইংরেজ জানুক, বিশ্বজগত জানুক, এ দেশের মেয়েরাও মুক্তিযুদ্ধের পিছনে নেই।"

এ সিদ্ধান্তের পরে কিছুদিনের মধ্যে আক্রমণের ব্যবস্থা নিখুঁত করার জন্য প্রত্যক্ষভাবে সব কিছু নিজে তদারক করার উদ্দেশ্যে তিনি কাট্টলী গ্রামে চলে আসেন। তাঁর নির্দেশে প্রীতিলতাকেও গোপনে সেখানে আনানো হয়।

মাষ্টারদা তাকে জানিয়ে দিলেন, ১৯৩২-এর ২৩শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করা হবে এবং তার নেতৃত্বভার তাকেই গ্রহণ করতে হবে।

প্রীতিলতার মনে এক নূতন শিহরণ। কোন বিপ্লবী অভিযানে এর পুর্বে যোগ দেবার সুযোগ তার হয়নি। কোন অভিজ্ঞতা তার নেই। আছে আদর্শের প্রতি অটুট নিষ্ঠা আর দেশের জন্য চরম আত্মদানের কঠোর সংকল্প, সে এককভাবে অথবা অন্য কারো সঙ্গে যাবে সশস্ত্র কোন অভিযানে। কিন্তু একটি অভিযানের নেত্রী হতে হবে, এত বড় দায়িত্বপালন করা কি তার পক্ষে সম্ভব হবে? এই

দ্বিধা তার দূর হয়ে গেল যখন সে দেখল গভীর বিশ্বাসে প্রধান নেতা তার দিকে তাকিয়ে আছেন। সে তাকে প্রণাম করে বলল, এই কাজে যেন সে সফল হয়। তিনি যেন তাকে সেই আশীর্বাদ করেন।

'দর্শনে' অনার্সের ছাত্রী প্রীতিলতা জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে বহু তত্ত্বালোচনা পড়েছে। তার মনে হয়, এই অভিযানে হয়ত বিপুল সম্ভাবনাময় তার জীবনের উপর পড়বে মৃত্যুর কালযবনিকা। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির এই সংগ্রাম তার মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনেরই সংগ্রাম। ঔপনিবেশিক শাসনের যূপকাষ্ঠে অগণিত দরিদ্র, নিরন্ন দেশবাসী নরনারী শিশু আজ বলি হচ্ছে, অকালে অবসান হচ্ছে তাদের জীবনের। অথচ আমাদের সোনার দেশে কি নেই? দেশে ছিল সবুজ ফসলের সমারোহ, গোলায় গোলায় ধান, অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের দেশ জুড়ে। অন্য দেশ থেকে এসে বণিকের মানদণ্ডকে গায়ের জোরে রাজদণ্ডে রূপান্তরিত করে যারা বসেছে তাদের অনুগ্রহপুষ্ট দেশীয় সামন্তবাদী জমিদার, জোতদার ও ধনীদের দালালীর দরুন আজ দেশের মানুষ ভিক্ষুক, নিরক্ষর, উলংগ ও মৃত্যুর প্রথম শিকার। এদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য, জীবনের দীপ্তি ফুটিয়ে তোলার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে আত্মদান করে গেছেন ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, প্রমোদ চৌধুরী, জালালাবাদের বার জন শহীদ, কালারপোলের চারজন বীর, শহরের ফিরিঙ্গিবাজারের অমরেন্দ্র নন্দী, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং আরও কত বীর তরুণ। তাদের মতো মৃত্যুর বিরুদ্ধে মহাজীবন প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে যাবার সুযোগ তাদেরও সামনে সমুপস্থিত। প্রীতিলতা শপথ নেয় মনে মনে পাহাড়তলী অভিযানে তাকে সফল হতেই হবে।

আক্রমণের পূর্বে কয়েকদিন পর্যন্ত রাত্রিতে কাট্টলীর সাগরতীরে

প্রীতিলতা ও তার সাথীদের অস্ত্র শিক্ষা চলে। আগের শিক্ষাকে আরও নিখুঁত করার জন্য বেশী অভিজ্ঞ নেতারা চেষ্টা করতে থাকেন। রিভলভার, পিস্তলের গুলীর শব্দ সমুদ্রের তরঙ্গ-গর্জনের মধ্যে মিলিয়ে যায়। সাগরও মরণপাগল বিপ্লবীদের কর্ম প্রচেষ্টার গোপনীয়তাকে বুঝি সাহায্য করে।

ক্রমে নির্ধারিত দিনটি এসে পড়ে। প্রীতিলতা দুইদিন পূর্বে রাত্রির নির্জনতায় দেশের মানুষের কাছে একটি আবেদন রচনা করে। বাংলায় তার দক্ষতা ছিল, কবিতাও সে মাঝে মাঝে লিখত। হয়ত দেশের কাছে তার বক্তব্য উপস্থিত করার সুযোগ আর হবে না। কেন মেয়ে হয়ে, কল্যাণী করুণাময়ী মাতা, ভগিনী, জায়ার মধুর মমতার অধিকারিণী হয়েও নিষ্ঠুর মরণলীলায় সে অংশ-গ্রহণ করতে যাচ্ছে, প্রীতিলতার মনে হয়েছিল সেই কৈফিয়ত দেওয়া দরকার। ইংরেজ কবি উপমা ব্যবহার করেছিল, 'বাঙ্গালী মায়ের মত কোমল'—সেই বাঙ্গালী মেয়ে কেন ঐ পরম কঠোর রূপে আবির্ভূতা হতে যাচ্ছে তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে নিজের মনের প্রশ্নগুলির জবাব সে ঐ আবেদনে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

মাস্টারদা তা পড়ে খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি স্থির করেন, প্রীতিলতার আবক্ষ ফটো দিয়ে 'ভারতীয় রিপাবলি-ক্যান আর্মি'-র চট্টগ্রাম শাখার পক্ষ থেকে একটি ইস্তাহার লাল একটি কাগজে ছাপিয়ে ঘটনার দিন সারা জেলায় বিলি করা হবে।

ক্লাব আক্রমণের আয়োজনে ক্লাবের একজন মুসলিম বাবুর্চির যে সহায়তা ছিল, তা আজ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। সে নিকটস্থ গ্রামের এক চাষীর ছেলে। বিপ্লবীদল কিছুদিন আগে তার সঙ্গে গ্রামে যোগাযোগ স্থাপন

করে। তার চাকুরী জীবনে ঐ ইংরেজ নরনারীর কাছ থেকে যে অপমানজনক ব্যবহার সব সময় পেয়ে এসেছে তার জন্য তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই সে বিক্ষুব্ধ ছিল। বিদেশী শাসকশ্রেণীর লোকরা এই দেশের মানুষের সঙ্গে, জাতিধর্মনির্বিশেষে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ সকলের সঙ্গেই যে চরম অমানবিক ব্যবহার করে, এই দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে এই দেশে দারিদ্র্য ও দুর্দশা ডেকে এনেছে বিপ্লবীদলের সঙ্গে আলাপে বাবুর্চি ভাইটি বুঝতে পারে।

তাই সে বিপ্লবীদলের নির্দেশে ক্লাবের দরজা জানালার সংখ্যা, প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ পথ, নৃত্যাদিতে লিপ্ত থেকে কখন ইংরেজ অফিসাররা পানোন্মত্ত থেকে কিছুটা অসতর্ক থাকবে, ক্লাব পাহারায় নিযুক্ত সশস্ত্র পুলিশ বা সৈনিকের সংখ্যা কত—এসব খবর সঠিকভাবে দেয়। তার রান্নাঘরের ছোট জানালা থেকে টর্চের আলো দিয়ে বিপ্লবীদের কেমন করে আক্রমণ সুরু করার সংকেত দেবে, তাও সে বলে দেয়।

প্রীতিলতার নেত্রীত্বে অন্য যে সব বিপ্লবীকে ঐ আক্রমণ পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করা হয়, তাঁরা হলেন :

১ শান্তি চক্রবর্তী———দক্ষিণ কাট্টলী, ডবলমুরিংস থানা
২ কালী দে———গোসাইলডাঙ্গা, ঐ
৩ প্রফুল্ল দাস———উত্তর কাট্টলী, ঐ
৪ সুশীল দে———ধোরলা, বোয়ালখালী থানা
৫ মহেন্দ্র চৌধুরী———মোহরা, পাঁচলাইশ থানা

সময় স্থির হয়েছিল রাত দশটায়।

প্রীতিলতা ও তার পাঁচজন সহযাত্রী এই অভিযানে যাত্রা করার জন্য তৈরী। খাকী সামরিক পোষাকে সজ্জিতা প্রীতিলতার কোমরে চামড়ার কটিবন্ধে গুলীভরা রিভলভার ও চামড়ার খাপে-

ভরা গুর্খা ভোজালী। পায়ে মোজা ও বাদামী রং-এর ক্যানভাসের রাবার-সোলের জুতা। মাথার দীর্ঘ কেশরাশিকে সুসংবদ্ধ করে তার উপরে বাঁধা হয়েছে সামরিক কায়দায় পাগড়ী।

অন্যান্য বিপ্লবীদের হাতে অস্ত্রাগার থেকে দখল করা রাইফেল, কোমরে রিভলভার ও ভোজালী, কাঁধের ঝোলাতে বোমা।

সর্বাধিনায়ক সূর্যসেনের কাছ থেকে শেষবার বিদায় নিয়ে এই অভিযাত্রীদল পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য যাত্রা করল। তিনি সকলকে বিজয়ী হবার জন্য আশীর্বাদ জানিয়ে পরম স্নেহে তাদের বিদায় দিলেন। প্রীতিলতা সবার শেষে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর কাছে একবার দাঁড়াল, তারপর সাথীদের নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লাবের কাছাকাছি পূর্ব-নির্ধারিত স্থানে এসে এই দলটি অপেক্ষা করতে লাগল বাবুর্চির কাছ থেকে টর্চ-লাইটের সংকেতের জন্য। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা গেল, টর্চ একবার জ্বলবে আবার নিভবে, এভাবে তিনবার হবে—সেই সংকেত পাওয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে 'চার্জ'' এই আদেশ দিয়ে রিভলভারের গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে প্রীতিলতা ছুটে এগিয়ে গেল, গুলীবর্ষণ ও বোমা নিক্ষেপ করে। উদ্দাম বিদেশী 'বল-নৃত্যের' মধ্যে নেমে এল মৃত্যুর হাহাকার আর ধ্বংসলীলা।

গুলী ও বিস্ফোরণের আর্তনাদের মধ্য দিয়ে ক্ষুদিরাম, তীতু মীর, অর্ধেন্দু, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি দেশ-প্রেমিক শহীদের জ্বলন্ত প্রতিশোধ যেন মূর্ত হয়ে উঠল। নীলকরদের নির্মম অত্যাচারে বিধ্বস্ত বাংলার কৃষক, জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বর হত্যালীলায় নিহত জনতা যেন অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের প্রতি নীরবে অভিনন্দন জানাচ্ছিল।

হতাহত ও বিভ্রান্ত ইংরেজ নরনারীর আর্তনাদে ক্লাব মুখরিত হয়ে গেল। অস্ত্রাগার দখল ও জালালাবাদ যুদ্ধবিজয়ী বীর বিপ্লবীরাই যে এই আক্রমণ করেছে, তা বুঝতে পেরে পাহারায় নিযুক্ত সশস্ত্র পুলিশরা বিনা যুদ্ধে পলায়নই শ্রেয় মনে করে যে যেদিকে পারে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রীতিলতা তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সফলভাবে সম্পন্ন করে হুইসেল দিয়ে সকলকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিল।

সামরিক নিয়মে আক্রমণের সময় নেতা থাকবে সবার আগে এবং ফিরবার সময়ে সাথীদের আগে ঠিকমত এগিয়ে দিয়ে নেতা যাবে পিছনে—এই নিয়মে বিপ্লবীসাথীর পিছন পিছন বিজয়িনীর গর্বে প্রীতিলতা ক্লাবের সামনে রেলের বড় সড়কে এসে ওঠে।

আক্রমণ চলার সময়ে ক্লাবে উপস্থিত অফিসাররা বিভিন্ন দরজা দিয়ে বাইরে পলায়ন করেছিল। ইংরেজ একটি যুবক ক্লাবের সংলগ্ন পশ্চিমদিকের নালার মধ্যে লম্বা হয়ে শুয়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল। অস্ত্রাগার দখলের পর থেকে চট্টগ্রাম অথবা বাংলার কোন জায়গায় ইংরেজরা কখনও নিরস্ত্র চলাফিরা করত না। নালার মধ্যে থাকা অবস্থায় সে লক্ষ্য করল বিপ্লবীরা তাদের কাজ শেষ করে ফিরে যাচ্ছে।

সবার পিছনে পাগড়ি মাথায় সামরিক পোষাকে প্রীতিলতা একা একা রাস্তা পার হয়ে প্রায় পৌঁছে গেছে পাহাড়তলী রেলওয়ে কারখানার উত্তর দিকের ছোট পায়ে-হাঁটা পথে। ঐ পথ গিয়ে মিশেছে রেলের 'ওভার-ব্রীজে' এবং সেটা পার হয়ে গেলে পাহাড়তলী বাজার। সেখান থেকে কাট্টলী গ্রামে গিয়ে পৌঁছতে বেশী সময় লাগে না। প্রীতিলতার সাথী পাঁচজন বিপ্লবী ঐ রাস্তায় এগিয়ে যাচ্ছে, গোপন আশ্রয় কেন্দ্রে গিয়ে তাদের

সাফল্যের সংবাদ দেবে প্রধান নেতাকে।

এমন সময় নালার মধ্য থেকে একটি গুলী এসে প্রীতিলতার বুকে লাগতেই তার রক্তাক্ত দেহ রাস্তার ধূলায় লুটিয়ে পড়ে।

রক্তস্রোতে প্রীতির স্বাভাবিক পোষাক ভিজে তার সামরিক পোষাকও রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে, তবু তার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়নি। তার কর্তব্য সেই অবস্থায় সে স্থির করে ফেলল।

যখনই বিপ্লবীদের এই রকম কোন অভিযানে পাঠানো হত, তখন অনেক সময় তাদের সঙ্গে দেওয়া হতো তীব্র বিষ 'পটাসিয়াম সায়েনাইড'-এর ছোট ছোট মোড়ক। গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় শত্রুপক্ষের হাতে পড়ে আরও লাঞ্ছনা নিপীড়ন ভোগ করতে গিয়ে কারও মনে যদি দুর্বলতার আভাস জাগে এবং ভুলে দলের গোপন কোন তথ্য প্রকাশিত হয়ে যেতে পারে, তখন নিজের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে হবে। তা যদি কোন কারণে সম্ভব না হয়, তখন খেয়ে ফেলতে হবে ঐ প্রাণঘাতী বিষের মোড়ক। এই বিষে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মৃত্যু নিশ্চিত। এই নির্দেশ বিশেষ করে মেয়ে-বিপ্লবীদের দেওয়া হত। সংঘর্ষে আহত অবস্থায় পুলিশের হাতে পড়লে তাদের জন্য ঐ বিষপানের জন্য বিশেষ নির্দেশ থাকত।

গুলীবিদ্ধ অবস্থায় রাস্তায় পড়ে গিয়ে যন্ত্রণাকাতর প্রীতিলতার মনে হল, এমন আহত অবস্থায় শত্রুর হাতে পড়ার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। গুলী তার বুকে লেগেছে তাতেই হয়ত তার মৃত্যু আসন্ন। আরও নিশ্চিত হবার জন্য প্রীতিলতা তার পকেট থেকে বিষের মোড়কটি খুলে নিজের মুখের মধ্যে ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দেহ তার হয়ে যায় নিথর নিশ্চল।

সেই যুগের প্রথম নারী-বিপ্লবী শহীদের প্রাণহীন ঐ দেহ বেশ কিছুক্ষণ ঐভাবে রাস্তায় পড়ে ছিল।

সাহসে ভর করে বেয়নেট-লাগানো রাইফেল নিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে পুলিশ, মিলিটারী ও গোয়েন্দা কর্মচারীরা ধীরে ধীরে ঘটনাস্থলে আসে। রাস্তায় যে মৃতদেহ তারা পড়ে থাকতে দেখে পোষাক দেখে তা যে কোন নারীর হতে পারে, সেটা কেউ ধারণাও করতে পারেনি। সরকারী ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করলে মৃতদেহ 'পোষ্ট মর্টেম' করার জন্য পাঠানো হয়।

পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণের পরে কলিকাতার ইংরেজদের সর্বপ্রধান সাপ্তাহিক "ইংলিশম্যানে" এই অভিযানের যে বিবরণ তখন প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল, প্রায় ৫৩ জন ইংরেজ নরনারী ঐ আক্রমণে হতাহত হয়েছিল। পত্রিকার সংবাদদাতা প্রীতিলতার শৌর্য-বীর্যের উচ্ছ্বসিত প্রসংসা করে তার নামের পূর্বে 'অসম সাহসিকা', 'বীর নারী' ইত্যাদি বিশ্লেষণ প্রয়োগ করেছিল। অবশ্য ঐসব দেখে কলিকাতার বৃটিশ এসোসিয়েশন প্রবল প্রতিবাদ করায়, ঐ সাপ্তাহিকের পরবর্তী সংখ্যায় সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয় এবং ঐ বিশেষণগুলি প্রত্যাহৃত হয়।

প্রীতিলতার মৃত্যু সম্পর্কে অনেক ভিত্তিহীন কাহিনী প্রচলিত আছে। এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী সূর্য সেন পরিচালিত চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সঙ্গে বহুদিনের বিরোধীভাবাপন্ন একজন ভূতপূর্ব বিপ্লবী ও পরে ভারতের কংগ্রেস দলে যোগদানকারী এবং পশ্চিম বাংলা সরকারের বেতনভোগী একজন কর্মচারীর লিখিত, চট্টগ্রামের বিপ্লবী অভিযানের ১৯৩০-এর এপ্রিল থেকে এই বিপ্লবীদলের সর্বশেষ কাজ, ১৯৩৫-এর ইংরেজ ক্রিকেট ক্লাব (বর্তমানে যেখানে চট্টগ্রাম 'ষ্টেডিয়াম') আক্রমণ পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ।

বইখানা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে লিখিত হয়েছিল, যদিও চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সেই গৌরবময় সংগ্রামের সঙ্গে কংগ্রেসের তৎকালীন নেতাদের যোগাযোগ ছিল এবং গৌরব ও মর্যাদার তারাও অংশীদার। সরকারী উদ্যোগে ঐ বইখানা অবলম্বন করে কলিকাতায় একটি সবাক ছায়াছবিও নির্মিত হয়েছিল। কলিকাতার বিভিন্ন সিনেমা হলে তা যখন প্রদর্শিত হয়, দর্শকদের প্রবল ভিড়ের নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হয়েছিল, কিন্তু ভুল ও উদ্দেশ্যমূলক তথ্য ঐ বইটিতে থাকায়, চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের অন্যতম প্রধান নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী* তার বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় নিয়ে দাবী করেছিলেন, ভুল তথ্যে ভরা ঐ ছায়াছবির প্রদর্শন বন্ধ না করলে, মহান সেইসব দেশপ্রেমিক আত্মত্যাগীদের প্রতি অসম্মান দেখানো হবে, তাদের মৃত্যুহীন প্রাণদানের প্রতি ঘোরতর অমর্যাদা প্রমাণ হবে। আদালত ঐ ছায়াছবি প্রদর্শন বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বইতে অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে প্রীতিলতা সম্পর্কে অসৌজন্যমূলক মন্তব্য ও তার মহান মৃত্যু সম্পর্কে উদ্দেশ্যমূলকভাবে রহস্যের ধূম্রজাল সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল। তার ফলেই প্রীতিলতার মৃত্যু সম্পর্কে কোন কোন মহলে কিছু ভুল ধারণা আছে। এই ভুল ধারণা দূর করা দরকার।

'পোষ্ট-মর্টেম' করতে গিয়ে যখন তার সামরিক পোষাক মৃতদেহ থেকে খোলা হয় তখনই প্রকাশ হয় যে, দেহটি একজন নারীর। তার দেহ তল্লাসীর পর নীচের জিনিসগুলি পাওয়া যায়:

১ মাথার পাগড়ী—ঐটি খোলার পরই তার দীর্ঘ কেশরাশি খুলে পড়ে।

২ পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাবের 'প্ল্যান' ১টি

---

* ১৯৬১-তে কলিকাতার সূর্য সেন ষ্ট্রীট (অতীতের মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট) অতিক্রম করার সময় বৃদ্ধ, রুগ্ন ও চিরকুমার নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী একটি ট্যাক্সি চাপা পড়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন।

৩ একটি 'হুইসেল'

৪ প্রীতিলতার ফটোসহ 'ভারতীয় রিপাবলিক্যান আর্মির' চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি সূর্য সেন স্বাক্ষরিত লাল রং-এর ইস্তাহার ১ খানা

৫ প্রীতিলতার স্বহস্ত-লিখিত বিবৃতি।

দলের মুদ্রিত ইস্তাহার ও তার নিজের রচিত বিবৃতিটিকে প্রীতি-লতা ভাল করে ভাঁজ করে অন্য একটি কাগজে মুড়ে তার পোষাকের ভিতরে সযত্নে রেখেছিল। সামরিক পোষাকের এক বুক-পকেটে ইউরোপিয়ান ক্লাবের 'প্ল্যান,' অন্যটিতে শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের একটা ফটো।

প্রীতিলতা সনাক্ত হওয়ার পর থেকেই সুরু হয়ে গেল পুলিশের বর্বর হামলা। প্রথমেই পুলিশ গেল তার এক কাকার বাসায়। তার পিতার সহোদর মেজ ভাই পাহাড়তলী রেলওয়ে কারখানায় চাকুরী করতেন এবং সেখানকার রেল-কোয়ার্টারে সপরিবারে থাকতেন। রাত্রেই তার বাসায় খানাতল্লাসী করতে গিয়ে তাঁকে, তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের মারধর করা হয়, তাঁকে ধাক্কা দিতে দিতে প্রীতিলতার মৃতদেহের কাছে এনে তাঁর কাছ থেকে পরিচিত স্বীকৃতি আদায় করা হয়। উপস্থিত ইংরেজ কর্মচারী তাঁকে সবুট পদাঘাতে মাটিতে ফেলে দেয়। প্রীতিলতাদের শহরের বাসার উপর ভীষণ পুলিশী হামলা চলে। সন্তানশোকাতুরা প্রীতিলতার মাও পুলিশের বর্বর ব্যবহার থেকে রেহাই পান না। তার বৃদ্ধ পিতাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রীতিলতার বয়ঃপ্রাপ্তা ছোটবোন ও ভাইদের উপর অশ্লীল কটূক্তি বর্ষিত হয়।

তারপর শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে বিপ্লবী সন্দেহে প্রায় একশত ছাত্র ও তরুণকে পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহে গ্রেফতার

করে এবং তথ্য সংগ্রহের জন্ম ক্রমাগত অত্যাচার চালায়। কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত ঐ তথ্যানুসন্ধান তথা পুলিশী জুলুম সত্ত্বেও অন্য কে কে ঐ ক্লাব আক্রমণে প্রীতিলতার সঙ্গে ছিল, তা কিছুতেই তারা জানতে পারেনি। বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় যে, চট্টগ্রামের অপর বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন দলের সঙ্গে সূর্য সেনের দলের কোন কাজের সম্পর্ক যে ছিল না গোয়েন্দা বিভাগ সে বিষয় ভালভাবে যদিও জানত, তবু ঐ আক্রমণের ফলে বিভ্রান্ত ও বিচলিত সরকারী কর্তৃপক্ষ ঐ ব্যাপারে অনুশীলন-দলের অনেক সদস্যকেও গ্রেপ্তার করেছিল। রাজনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন অনেককেও পুলিশ গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। পরে ঐ আক্রমণের জন্য কয়েকজনকে আসামী করে পুলিশ একটি মামলাও সুরু করেছিল। সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে ঐ মামলায় সবাই বেকসুর খালাস পায় এবং পরে তাদের মধ্যে কয়েকজনকে বিনাবিচারে আটক করা হয়।

প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে সরকার প্রীতিলতার পিতা ও পিতৃব্যকে তাঁদের বহুদিনের পুরাতন চাকুরী থেকে বরখাস্ত করাবার ব্যবস্থা করে। তার ফলে এই গরীব মধ্যবিত্ত দু'টি পরিবারের দুর্দশার সীমা থাকে না। প্রীতিলতার পিতা তখন থেকে বছর দশেক পূর্বে তার মৃত্যু পর্যন্ত গৃহ-শিক্ষকতা করে জীবিকা অর্জন করে গেছেন। তার মা সংসার চালাবার জন্য বাধ্য হয়ে পারিবারিক আভিজাত্য ও সাময়িক বিধিনিষেধকে অবহেলা করে ধাত্রীর কাজ শিখে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করতে সুরু করেন। তিনি কয়েক বছরের মধ্যে চট্টগ্রাম শহরের শ্রেষ্ঠ ধাত্রী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়।

পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ মামলায় সরকার পক্ষ থেকে, প্রীতিলতার স্বহস্তলিখিত যে বিবৃতি তার মৃতদেহের পোষাকের মধ্যে পাওয়া যায়, তা আদালতে উপস্থিত করা হয়:

"আমি বিধিপূর্বক ঘোষণা করিতেছি, যে প্রতিষ্ঠান উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, অত্যাচারের স্বার্থসাধনে নিয়োজিত সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন করিয়া আমার মাতৃভূমি ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করিতে ইচ্ছুক, আমি সেই ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার একজন সদস্যা।

এই বিখ্যাত "চট্টগ্রাম শাখা" দেশের যুবকদের দেশপ্রেমকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। স্মরণীয় ১৯৩০-এর ১৮ই এপ্রিল এবং উহার পরবর্তী পবিত্র জালালাবাদ ও পরে কালারপুল, ফেনী, ঢাকা, কুমিল্লা, চন্দননগর ও ধলঘাটের বীরোচিত কার্যসমূহই ভারতীয় মুক্তিকামী বিদ্রোহীদের মনে এক নূতন প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছে।

আমি এইরূপ গৌরবমণ্ডিত একটি সঙ্ঘের সদস্যা হইতে পারিয়া নিজেকে সৌভাগ্যবতী অনুভব করিতেছি।

আমরা দেশের মুক্তির জন্যই এই সশস্ত্র যুদ্ধ করিতেছি। অদ্যকার পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি অংশ।

বৃটিশ জোরপূর্বক আমাদের স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইয়াছে। ভারতের কোটি কোটি নরনারীর রক্তশোষণ করিয়া তাহারা দেশে নিদারুণ দুর্দশার সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারাই আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্বংসের এবং সকল অধঃপতনের একমাত্র কারণ। সুতরাং তাহারাই আমাদের একমাত্র শত্রু। স্বাধীনতা লাভ করার পথে তাহারাই আমাদের একমাত্র অন্তরায়। যদিও মানুষের জীবন সংহার করা অন্যায়, তবু বাধ্য হইয়া বড় বড় সরকারী কর্মচারীর ও ইংরেজদের জীবন-সংহার করিতে আমরা অস্ত্রধারণ করিয়াছি। মুক্তিপথের যে-কোন বাধা বা অন্তরায় যে-কোন উপায়ে দূর করার জন্য আমরা সংগ্রাম করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।



একশ' তের

আমাদের দলের মহামান্য ও পূজনীয় নেতা মাষ্টারদা অদ্যকার এই সশস্ত্র অভিযানে যোগ দিবার জন্য যখন আমাকে ডাক দিলেন, তখন আমি নিজেকে যথেষ্ট সৌভাগ্যবতী মনে করিয়াছিলাম। মনে হইল, এতদিনে আমার বহু প্রত্যাশিত অভীষ্ট সিদ্ধ হইল এবং সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া আমি এই কর্তব্যভার গ্রহণ করিলাম। এই উন্নত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতৃত্ব যখন আমার মত একটি মেয়েকে এই গুরুভার অর্পণ করেন, তখন এতগুলি কর্মঠ ও যোগ্যতর ভাইয়েরা বর্তমান থাকিতে অভিযানে নেতৃত্বের ব্যাপার একজন ভগিনীর উপর কেন ন্যস্ত হইবে, এই বলিয়া আমি আপত্তি জানাইলাম এবং একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে ঐ কাজে যাইতে চাহিলাম।

কিন্তু আমি পরে পূজ্য নেতার আদেশ নিরোধার্য করিয়া লইলাম।

আমি মনে করি যে, আমি দেশবাসীর নিকট আমার কাজের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনও হয়ত আমার প্রিয় দেশবাসীর মধ্যে এমনও অনেকে আছেন, যাঁহারা বলিবেন যে— ভারতীয় নারীত্বের উর্ধ্বতন আদর্শে লালিত একটি নারী কি করিয়া নরহত্যার মত এই ভীষণ হিংস্র কাজে লিপ্ত হইল।

দেশের মুক্তি-সংগ্রামে নারী ও পুরুষের পার্থক্য আমাকে ব্যথিত করিয়াছিল। যদি আমাদের ভাইয়েরা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে, আমরা ভগিনীরা কেন উহা পারিব না? ইতিহাসে অনেক উদাহরণ আছে, রাজপুত রমণীরা অসীম সাহসের সহিত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতা ও নারীত্বের মর্যাদা রক্ষার জন্য তাহারা শত্রুর প্রাণ-সংহার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। ইতিহাসের পৃষ্ঠা এইরূপ আরও কত নারীর বীরত্বগাঁথায় পূর্ণ। তবে কেন আমরা আজিকার

ভারতীয় নারীরা বিদেশীর দাসত্বশৃংখল হইতে নিজের দেশকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য এই মহান যুদ্ধে যোগদান করিব না? যদি বোনেরা ভাইদের সঙ্গে কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিতে পারে, তবে সশস্ত্র বিদ্রোহে যোগদানে তাহাদের বাধা কি? সশস্ত্র বিদ্রোহে অন্য দেশের নারীরা বিপ্লবের এই পন্থাকে অন্যায় বলিয়া মনে করিবে?

নারীরা আজ কঠোর সংকল্প নিয়াছে যে, আমার দেশের ভগিনীরা আজ নিজেকে দুর্বল মনে করিবেন না। সশস্ত্র ভারতীয় নারী সহস্র বিপদ ও ও বাধাকে চূর্ণ করিয়া এই বিদ্রোহ ও সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করিবেন এবং তাহার জন্য নিজেকে তৈয়ার করিবেন—এই আশা লইয়াই আমি আজ আত্মদানে অগ্রসর হইলাম।''

(স্বাক্ষর) প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার
২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ ইং

প্রীতিলতার এই বিবৃতি থেকেই আমরা বুঝতে পারি কী গভীর দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতের মুক্তির জন্য তিনি ঐদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে গিয়েছিলেন। সশস্ত্র বিপ্লব যে প্রীতিলতার মত মৃত্যুভয়হীন কিছু মধ্যবিত্ত ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণীর চরম আত্মদানের মধ্য দিয়ে সফলভাবে সংগঠিত হতে পারে না, তখনকার রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থায় তা সঠিক ভাবে উপলব্ধি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কিন্তু যতটা তাঁরা বুঝেছিলেন, ততটা চেতনা যে গভীর দেশপ্রেমে সমৃদ্ধ ছিল, এটা অনস্বীকার্য। তাকে পাথেয় করেই তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ও সংগ্রামে নিঃস্বার্থ আত্মদানের যে বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তার রাজনৈতিক

ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানের এতকাল পরও স্বাধীনতার স্বরূপ সম্পর্কে বিতর্কের অবসান হয়নি। শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজে যে জনগণের শোষণমুক্তি আসে না, তাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রকৃত মুক্তি আসে না, তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এখন দিন দিন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গণশোষণ ও নিপীড়নের উপর ভিত্তি করেই যে শাসনব্যবস্থা তা যে বহুপঠিত রামসুন্দর বসাকের "বাল্যশিক্ষার" কথা—'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' কথাটি তার অতিবিশ্বস্ত অনুসারী, তা সপ্রমাণিত হচ্ছে, ভিয়েতনামে, আফ্রিকায়, আরবভূমিতে আর দক্ষিণ আমেরিকায় এবং এশিয়া আফ্রিকার অনেক দেশে।

প্রীতিলতার অমর জীবন থেকে এই দেশের মেয়েরা তার অবিচল আদর্শ নিষ্ঠার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে বোনদের সমানে সংগ্রাম করার যে দাবী আজ থেকে প্রায় তিন যুগ পূর্বে তিনি উত্থাপন করেছিলেন, সংগ্রাম ও ইতিহাসের পরিবর্তিত রূপে এবং বিশ্বের বহু বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির পরও, আমাদের দেশে প্রীতিলতার সেই দাবী আজও বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

প্রীতিলতার এই জীবনকাহিনী নূতন, সুন্দর ও সুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এই দেশের নারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন থেকে নারীদেরও মুক্ত করে. রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে নারীপুরুষের অধিকারে পূর্ণ সাম্য আনুক, এই আশা পূরণে—প্রীতিলতার শৌর্য, সাহস ও অম্লান আদর্শনিষ্ঠা এই দেশের মেয়েদের কাছে এক অমূল্য উত্তরাধিকার হয়ে রইল।

———